বিবেকানন্দের শিকাগো ভাষণ ও রচনা : বিষয়বৈচিত্র্য ও গদ্যশৈলী

মিলটন কুমার দেব*

সারসংক্ষেপ : স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ভাষণসহ অন্যান্য রচনা বিষয়বৈচিত্র্য ও শৈলীগত উৎকর্ষে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাঁর রচনা যেমন ব্যক্তিত্বমণ্ডিত, তেমনি স্বতন্ত্র চিহ্নায়নের লক্ষ্যাভিমুখী। মোহনীয় শাব্দিক আবেগরাশির প্রয়োগে তিনি প্রবন্ধের পুরনো ঐতিহ্যকে ভাসিয়ে নিয়ে যান। গদ্যরচনার বৈচিত্র্যের মাঝে বিবেকানন্দের মানসভঙ্গি, জীবনদৃষ্টি, সমকালীন সমাজের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, ধর্ম-সম্পর্কিত রোধ, বিদ্রোহী চেতনার স্বরূপ এবং সমকালীন সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের পরিচয় মেলে। বিবেকানন্দের গদ্যরচনার বিষয়বৈচিত্র্য ও শৈলী বিবেচনাই এ প্রবন্ধের অন্বিষ্ট।

বিশ্বের ইতিহাসে সমগ্র উনিশ শতক ছিল বাঙালির জন্য রেনেসাঁ[১] যুগ। এই শতক বাঙালির নবজাগরণের পথিকৃৎদের বিপুল আবির্ভাব ও বিচিত্র কর্মযজ্ঞে সমৃদ্ধ ও ধন্য। দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন ও নবজাগরণের এই কালে বিশাল বাংলায় অনেক কর্মবীর এবং চিন্তানায়কই স্বীয় কর্মপ্রচেষ্টা ও প্রতিভা দ্বারা জগৎব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন, যেসব বাঙালি মনীষা[২] উনিশ শতকে নবচেতনার নেতৃত্বে ছিলেন তাদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব মনীষা বাংলার গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মধ্য হতে যুগোপযোগী দিগদর্শন নির্দেশ করে শুধু দেশমাতৃকা ও স্বদেশবাসীকেই গৌরবান্বিত করেননি বরং বৃহত্তর বঙ্গবাসী যে বিশ্বদরবারে মর্যাদার আসন লাভ করার যোগ্য — তা প্রমাণ করতে সমর্থ হন।

এ প্রবন্ধের আলোচ্য ব্যক্তিত্ব সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ[৩] বিশ্ব ইতিহাসে এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত।[৪] শ্রীরামকৃষ্ণের[৫] শিষ্যত্ব গ্রহণের পর তিনি 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে পরিচিতি লাভ করেন। তবে স্বামীজি[৬] নামে তিনি অধিক পরিচিত। ১৮৯৩ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে ধর্ম মহাসভায়[৭] অংশ নিয়ে বিবেকানন্দ যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা তাঁকে জগৎবিখ্যাত করে তুলেছিল। ক্রিস্টোফার কলম্বাস (১৪৫১-১৫০৬) কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের চারশ' বছর পূর্তি উপলক্ষে আন্তর্জাতিক এ মহাসম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সম্মেলনে বিবেকানন্দ অবিসংবাদিতভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তা বলে স্বীকৃত হন। তাঁর ভাষণ শ্রোতৃবর্গের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। স্বামীজি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছিলেন অবিভক্ত বাংলা অঞ্চলের ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিকতা।[৮] বিবেকানন্দ অন্তর্মগ্ন আবেগে,

*সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সংবেদনায় লেখকসত্তার একনিষ্ঠ আন্তরধর্মে যথার্থ অর্থেই একজন মৌলিক রচয়িতা। তিনি শুধু ভাষণ প্রদান করেননি, সমসাময়িক পৃথিবীব্যাপী সামূহিক অবক্ষয় অত্যাচারের এবং রক্ষণশীলতার অচল-অটল স্তম্ভ ধ্বংসের সূচনায়, নিপীড়িত মানুষের সপক্ষে বৈষম্যহীন সমাজবিন্যাসের বাসনায়, প্রেমাকাঙ্ক্ষায়, ক্ষোভ-যন্ত্রণা-বিদ্রোহকে বাস্তব রূপ দানের জন্য এবং জীর্ণ-পুরাতনকে ভেঙে নতুন সমাজ নির্মাণের অঙ্গীকারে, অন্তরচৈতন্যের অনুধাবন সত্তার তীব্র আলোর সম্পাতে রচনা করেছেন প্রবন্ধ ও গ্রন্থ।

॥১॥

এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে বিবেকানন্দের ভাষণ ও এর বিষয়বৈচিত্র্য আলোচিত হবে। দ্বিতীয় অংশে থাকবে তাঁর রচনার গদ্যশৈলী। যাঁরা নিয়মিত ভাষণ দেন বা বিদগ্ধ শ্রোতা, তাঁরা সকলেই অবগত যে, একটি ভাষণের সফলতা নির্ভর করে ভাষণের বিষয়ভাবনা এবং শৈলীর ওপর। ভাষণশৈলী দুর্বল হলেও বিষয়বৈচিত্র্যের অভিনবত্ব ভাষণকে উতরে দিতে সক্ষম। আবার বিপরীতও হয়, বিষয়বৈচিত্র্য তেমন কিছু নয়, কিন্তু ভাষণশৈলী শ্রোতাদের মোহিত করছে। বলা বাহুল্য, বিষয়বৈচিত্র্য এবং ভাষণশৈলী দুটোই যখন বিশেষ মানে সমন্বিত হয়, তখনি ঘটে ভাষণের মূল সফলতা। বিবেকানন্দের শিকাগো ভাষণে সেটাই ঘটেছিল। শিকাগো শহরের আমজনতা স্বামীজির ভাষণ শুনে তাৎক্ষণিকভাবে আবেগতাড়িত হয়েছে, মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছে। তার কারণ, স্বামীজির চেহারা, ব্যক্তিত্ব, কণ্ঠস্বর, শব্দচয়ন ও ভাষণ শৈলীর অভিনবত্ব। শিকাগো ভাষণ প্রদান ও এর বিশেষত্ব সম্পর্কে বিবেকানন্দের জীবনীকার রোঁমা রোলার মত :

> Each of the other orators had spoken of his God, of the God of his sect, He (Vivekananda) alone spoke of all their Gods, and embraced them all in the universal Being. (Romain, 1970 : 38)

বিবেকানন্দের ভাষণশৈলী বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই যা চোখে পড়বে তা হল ভাষণের প্রারম্ভিকা — প্রথম বাক্য বা বাক্যাংশের উচ্চারণটা। এখানে মনে আসবে ফ্রান্সিস বেকনের মতো সফল ইংরেজ প্রবন্ধকারের নাম। প্রথম উচ্চারণটাই চমক জাগানিয়া; পাঠক বা শ্রোতাকে সজাগ করছে, কৌতূহলী করছে, মনোযোগী করছে। ১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ সালে আমেরিকার আর্ট ইনস্টিটিউটের কলম্বাস হলে প্রথম ভাষণের প্রারম্ভেই 'Sisters and Brothers of America'[৯] — এই ছোট্ট সম্বোধন আর উচ্চারণেই তিনি তুলে ধরলেন সম্মেলনের মূললক্ষ্য — বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপন। সেই সাথে আন্তরিক আবেগের রাখিবন্ধনে বন্দি করলেন উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য এই সম্মেলনের শ্লোগানই ছিল 'বিশ্বভ্রাতৃত্ব'। ১৫ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় ভাষণ। এ দিনের প্রথম উচ্চারণেও স্বামীজি শ্রোতাদের কাছে টেনেছেন; তবে ভাই যেমন অন্য ভাই বোনদের কাছে আনেন সেরূপ নয়! পরবর্তী বংশধর পরিবৃত বয়োজ্যেষ্ঠর মতো আরম্ভ করছেন : I will tell you a little story; ব্যাঙের গল্প।

১৯ সেপ্টেম্বর তৃতীয় ভাষণ — 'Paper on Hinduism' মূলত ছিল — অনেক তত্ত্ব, দর্শন, যুক্তির সমন্বিত উপস্থাপন। এবার তিনি ইতিহাস বা দর্শনের শিক্ষকের মতো গুরুগম্ভীরভাবে শুরু করলেন, 'Three religions now stand in the world which have came down to us from time prehistoric'।[১০]

চতুর্থ বক্তৃতায় তিনি খ্রিষ্টান মিশনারিদের আক্রমণ করছেন এবং আক্রমণটা প্রথম বাক্যেই : (You) Christians must always be ready for good criticism.[১১] পরবর্তী ভাষণে বিবেকানন্দ দেখান — বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই একটি পরিমার্জিত রূপ মাত্র; স্বতন্ত্র কিছু নয়। তাই তার ভাষণের প্রথম বাক্যটিই কূটাভাষে (Paradox) ঋদ্ধ : 'I am not a Buddhist... and yet I am'। শেষ ভাষণে (২৭ সেপ্টেম্বর) তিনি শিকাগো সম্মেলনের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানাবেন আর সেটা তাঁর প্রথম বাক্যেই তিনি করলেন, 'The world's parliament of religion has become an accomplished fact'।[১২]

শ্রোতাদের মাঝে কৌতূহল সৃষ্টি এবং মনোযোগ ধরে রাখার জন্য বাগ্মিতার অত্যন্ত সহজ একটি পদ্ধতি যথাযথ স্বামীজি বহুবার ব্যবহার করেছেন। একনাগাড়ে হ্যাঁ-বাচক আর না-বাচক বাক্য ব্যবহার না করে মাঝে মাঝেই সভাকে সচকিত করে তাদের সামনে প্রশ্ন রেখেছেন; পরক্ষণে নিজেই উত্তর দিয়েছেন। এরূপ একটা বিশেষ উদাহরণের দিকে লক্ষ করা যাক। 'Paper on Hinduism'-এর একটি অনুচ্ছেদে পর পর দুটি প্রশ্ন এবং করুণ দুটি চিত্রকল্প 'Is man a tiny boat in tempest..., a little moth placed under the wheel of causation'? এসকলের পরিপ্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসা : Is there no hope? is there no escape?[১৩] প্রথমে প্রশ্ন, পরক্ষণেই উত্তর। প্রশ্নের দ্বারা সৃষ্টি করছেন শংকা, ভয়, বিষাদ, আবার উত্তরের দ্বারা দিচ্ছেন বিশ্বাস, অভয়, আনন্দ। অনেক জনপ্রিয় বক্তাই এরকম করে থাকেন। কারো কারো জন্য তা মুদ্রাদোষও হয়ে যায়। তবে পরিবেশ ও বিষয়ভাবনার গুরুত্বের সাথে মিল রেখে বাছাইকৃত শব্দবন্ধ গঠন করলে প্রশ্নসূচক এই বাক্যগুলো আমাদের গভীরতম আবেগ-অনুভূতিগুলোকে নাড়া দিয়ে থাকে। স্বামীজির শিকাগো ভাষণে এমনটিই হয়েছে। কবিতার ভাষায় প্রায়ই চোখে পড়ে, এমন অন্য একটি শব্দ বিন্যাসরীতি বিবেকানন্দ প্রচুর ব্যবহার করেছেন — বিশেষ্য ও বিশেষণের স্থান বিনিময়; আগে বিশেষ্য, পরে বিশেষণ ব্যবহারের অজস্র উদাহরণ আছে, তার মাঝে কয়েকটি — Joy unspeakable (প্রথম ভাষণের প্রথম পঙক্তি); Time prehistoric ('paper on Hinduism'-এর প্রথম বাক্য) এবং আরো বহু ওই একই ভাষণে — Knowledge absolute, souls immortal, bliss infinite ইত্যাদি।

এবার আসা যাক চিত্রকল্পে। যেকোনো ভাল ভাষণের অবিচ্ছেদ্য উপাদান — উপমা, রূপক, চিত্রকল্প। বিবেকানন্দের যেকোনো ভাষণ হতে পাওয়া যায় অগণিত

উদাহরণ। সব থেকে তাৎপর্যবহ জল, প্রবাহ, ঝরনা নদী, সমুদ্রের চিত্র। খুবই স্বাভাবিক। বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বিবেকানন্দের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল তো এটাই। সব ভিন্ন ভিন্ন নদী যেমন করে স্বতন্ত্র ধারায় বহমান হয়ে শেষতক সমুদ্রে মিশে, তেমনি আলাদা মানুষের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মচেতনা ভিন্ন ভিন্ন আচার-রীতির পথ ধরে পৌছে যায় অভিন্ন শক্তির চেতনায়। ১১ সেপ্টেম্বর প্রথম দিনের ভাষণেই অবিভক্ত বাংলার ধর্ম ও ঈশ্বরচেতনা বিষয়ে বিবেকানন্দ বলেন 'As the different streams having their sources in different places, all mingle their water in the sea'।[১৪] ১৫ সেপ্টেম্বর ভাষণে জলের ছবি। কুয়োর জল, যার মধ্যে ব্যাঙ — যে কথা বলছে অন্য একটি ব্যাঙের সাথে, যার বাস সমুদ্র। ১৯ সেপ্টেম্বরের মুল ভাষণে অগণিত উপমা। প্রথমেই সমুদ্র। অন্য কত ধর্ম বাইরের আঘাতে অবলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু সনাতনধর্ম! সাময়িকভাবে পিছিয়ে যায়, আবার এগিয়ে আসে বহুগুণ শক্তিশালী হয়ে, প্রবল বন্যার আকারে। উল্লেখ্য, সম্মেলনের বিভিন্ন স্তরে স্বামীজি মোট বারোটি ভাষণ প্রদান করলেও আনুষ্ঠানিকভাবে সাত দিন বক্তব্য রাখেন। ২৭ সেপ্টেম্বর ছিল সম্মেলনের সপ্তদশ দিবস; এদিন সমাপনী সম্মেলনে তিনি *বিদায়* শিরোনামে তাঁর ভাষণ দেন। সংক্ষিপ্ত ভাষণ হলেও এটি ছিল মহাসভার আত্মা। এ ভাষণে স্বামীজি বলেন—

> আমি চাইনা কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ খ্রিষ্টান হোক। প্রতিটি ধর্মকে অন্যান্য ধর্ম হতে সারবস্তু গ্রহণ করে সেগুলোকে মিলিয়ে নিয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রেখে নিজস্ব বৃদ্ধির স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী বেড়ে উঠতে হবে। কেউ যদি স্বপ্ন দেখেন, একমাত্র তাঁর ধর্মই টিকে থাকবে এবং অন্য সকল ধর্ম বিনাশপ্রাপ্ত হবে, তাহলে আমি আমার অন্তঃস্ত্হল হতে তাঁর প্রতি করুণা প্রদর্শন করি এবং সেই সঙ্গে তাঁকে একথাও বলে দিচ্ছি যে, বাধা দান সত্ত্বেও প্রতিটি ধর্মের পতাকার উপরে লেখা থাকবে — বিবাদ নয়, সহায়তা; ধ্বংস নয়, সম্মিলন; মতবিরোধ নয়; সমন্বয় ও শান্তি। (সুধাংশু, ১৪২০ : ৪১২)

এ ভাষণের নির্যাস হলো–

১. কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন;
২. অন্যধর্মের স্বীকৃতি ও সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা;
৩. মানুষের মাঝে ঐক্য-সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং
৪. উগ্রতা-সাম্প্রদায়িকতার চির অবসান কামনা।

এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে স্বামীজির শিকাগো ভাষণ একটি ঐতিহাসিক এবং বিশ্লেষণাত্মক ভাষণে পরিণত হয়েছে।

॥২॥

এবার প্রবন্ধের এই অংশে বিবেকানন্দের রচনা ও গদ্যশৈলী নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমেই বলা দরকার যে, স্বামীজির লিখিত গ্রন্থ এবং প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্র্য ও নিজস্ব ব্যক্তিত্বমণ্ডিত মোহনীয় শাব্দিক আবেগরাশির প্রয়োগ স্রোতে ভেসে যায় সমস্ত প্রাবন্ধিক

ঐতিহ্য। আর এজন্য তাঁর প্রাবন্ধিক চেতনাপ্রবাহ বিষয় এবং গদ্যকাঠামো স্বতন্ত্র একটি চিহ্নায়নের স্রোতমুখী। বিবেকানন্দের প্রাবন্ধিক গদ্যকে নিম্নলিখিত শ্রেণিকরণ করা যায়:

ক) প্রবন্ধ গ্রন্থ
খ) অগ্রন্থিত প্রবন্ধ
গ) গ্রন্থ সমালোচনা
ঘ) অনুবাদ
ঙ) চিঠিপত্র

গদ্যরচনার এই বৈচিত্র্যের মাঝে বিবেকানন্দের মানস-ভঙ্গি, জীবন-সম্পর্কিত ধারণা, সমকালীন সমাজের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, ধর্ম-সম্পর্কিত চেতনা, বিদ্রোহী চেতনার স্বরূপ এবং সমকালীন সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। উপযুক্ত শ্রেণিকরণে বিবেকানন্দের গদ্য-রচনার পরিসর-অন্তর্গত লেখনীর বিষয়বৈচিত্র্য এবং গদ্যশৈলী পর্যালোচনাই এই আলোচনার অন্বিষ্ট।

বিবেকানন্দের চিন্তা ও কর্মযজ্ঞের আবেগময় কথামালার স্বগতকথনের ভাবানুষঙ্গ, বক্তব্যানুভূতির অভিব্যক্তি ঘটেছে তাঁর রচিত *ভাববার কথা* (১৩০৫-১৩০৮), *পরিব্রাজক* (১৩০৫-১৩০৮), *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য* (১৩০৬-১৩০৮) এবং *বর্তমান ভারত (১৩০৫-১৩০৬)* — এই কয়েকটি রচনায়। ব্যক্তিগত পত্রাবলি বাদ দিলে প্রধানত এই কয়েকটি রচনা অবলম্বনে তাঁর গদ্যশৈলী আলোচিত হবে। বলা বাহুল্য, মাত্র কয়েকটি বাংলা মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেই তিনি বাংলা গদ্যের অন্যতম এক শিল্পী হিসেবে গণ্য হয়েছেন। তবু 'মানুষটিই শৈলী' (The style is the man) ফরাসী প্রাণিবিজ্ঞানী বুফোঁ-র তত্ত্বসিদ্ধান্তের ফাঁদে প্রথমেই আমরা পড়তে চাই না। চাই না এ কারণে যে, আমরা বিশ্বাস করি, কেবল লেখকের অন্তর্গত উৎস থেকেই তার শৈলী নির্গত হয় না। লেখকের শৈলীকে বিশেষত্ব দেয় তার বহির্বর্তী নানা প্রভাব যা তাঁর প্রকাশকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই প্রভাবগুলোকে সংক্ষেপে তালিকাবদ্ধ করা যেতে পারে। সেগুলো হলো —

ক. লেখকের সমকালীন গদ্যশৈলী, তা থেকে তাঁর সচেতনভাবে পৃথক হওয়ার বা তার কাছাকাছি থাকার চেষ্টা।
খ. রচনাটির সংরূপ (genre) প্রবন্ধ এক ধরনের ভাষা দাবি করে, উপন্যাস-গল্প আরেক ধরনের।
গ. রচনাটির বিষয় — গাম্ভীর্যপূর্ণ না লঘু।
ঘ. রচনার বিষয় যেমনই হোক, কিছু ক্ষেত্রে লেখকের ব্যক্তিত্ব বিষয়কে সবচেয়ে বেশি করে বশীভূত করতে চায়, বিষয়ের দ্বারা বশীভূত না হয়ে। লেখকের সাথে বিষয়ের এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটি রচনায় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
ঙ. পাঠকমাত্রা — কোন্ বা কোন্ শ্রেণির পাঠকের জন্য রচনাটি লেখা হয়েছে তারও প্রভাব শৈলীতে পড়বে। বয়স্ক পাঠক আর শিশু-কিশোর পাঠকের জন্য ভাষা আলাদা হওয়ারই কথা।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যক্তিগত পত্রাবলি বাদ দিলে বিবেকানন্দের গদ্যগ্রন্থ চারটি। এসব বাংলা গদ্যরচনাই তাঁর ভাষাশৈলী বিশ্লেষণে আমাদের মূল অবলম্বন। *পরিব্রাজক* স্বামীজির দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার পত্রবর্ণনা। ভাষা চলিত গদ্য। ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জুন তিনি কলকাতা থেকে জাহাজযোগে তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতাকে সাথে নিয়ে বিলাতযাত্রা করেছিলেন। *উদ্বোধন* পত্রিকার সম্পাদক ত্রিগুণাতীতানন্দের অনুরোধে চিঠিতে যে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখে পাঠান (১৩০৫-০৬), তারই গ্রন্থিত রূপ *পরিব্রাজক*। কলকাতার গঙ্গা থেকে দাক্ষিণাত্য ও সিংহল ছুঁয়ে, এডেন হয়ে লুভর মিউজিয়াম পর্যন্ত তাঁর পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার বিষয়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রবন্ধের আকারে লিখিত। এরও অবলম্বন চলিত গদ্য। এতে স্বামীজির একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল — দুই মেরুর, বিশেষত ও ব্রিটেন ও বাংলার সভ্যতা-সংস্কৃতির তুলনা। এখানে তথ্য ও সংবাদ যেমন উপস্থিত আছে, তেমনি আছে নিজস্ব বিচার ও সিদ্ধান্তের একটি শক্তিশালী প্রয়োগ। তবে, *বর্তমান ভারত*-এর প্রবন্ধ-চরিত্র সবচেয়ে বেশি। ভাষা সাধু গদ্য। এখানে উদ্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিগত পাঠক নেই; আছে একটি অমূর্ত সত্তা, যাকে শেষ পর্যায়ে এসে বিবেকানন্দ 'হে ভারত' বলে সম্ভাষণ করেন। *ভাববার কথা-র* কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যেও এই লেখক এবং পাঠকের দূরত্বরক্ষার চেষ্টা কিছুটা দেখা যায়। অর্থাৎ প্রায়ই মনে হয় যে, স্বামীজির রচনায় ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক এই দুটি মাত্রা সবসময় বিচ্ছিন্ন থাকে না — এক হতে অন্যের মধ্যে চলাচলের পথটি খোলা থাকে। তবু অধিকাংশত নৈর্ব্যক্তিক এবং অধিকাংশত ব্যক্তিগত — এই অংশগুলোকে হয়ত নির্দিষ্ট করা যায়। যেমন টমাস কেম্পিসের 'Immitation of christ'-এর অসম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ *ভাববার কথা* অংশটি প্রায় পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক। তা হবারই কথা, কেননা, 'অনুবাদ যথাসম্ভব অবিকল রচনার চেষ্টা'-তে লেখকের ব্যক্তিত্বের অনুপ্রবেশ প্রায় অসম্ভব। তাই ভাষা মূলের অনুকরণে বাধ্য হয়। যেমন ইংরেজি অন্বয় বা সিন্ট্যাক্সের এই ধরনের বহুস্তরপ্রোথিত (Multiembedded) জটিল ও যৌগিক বাক্যের অনুবাদ — 'তিনি যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা অন্য সকল মহাত্মাপ্রদত্ত শিক্ষাকে অতিক্রম করে এবং যিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত, তিনি 'মান্না' প্রাপ্ত হইবেন'। এই অংশে দুটি পক্ষের কথা আছে — একজন শিক্ষা দেন এবং আরেকজন সে শিক্ষা সফলতার সাথে গ্রহণ করেন। কিন্তু শিক্ষাদাতার চেয়ে শিক্ষার মাহাত্ম্যই এখানে বেশি চিহ্নিত — 'যে শিক্ষা' 'তাহা অন্য সকল' ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্যদিকে শিক্ষার গ্রাহককেও 'যিনি' ও 'তিনি'-র বন্ধনে দ্বিতীয় বাক্যে চিহ্নিত করে বলা হয়েছে, তাঁর অর্জন কিরকম হওয়া উচিত। মাঝখানে 'এবং' দিয়ে এ দুটি জটিল বাক্যকে যোগ করা হয়েছে। ইংরেজি বাক্যরীতির, বিশেষত ধর্মগ্রন্থের বাক্যরীতির এই শৈলীতে অনুবাদকের নিজস্বতা সংযোগ করার সুবিধা কম, মূলের বক্তব্যকে বিশ্বস্তভাবে নিজের ভাষায় পাঠকের নিকট পৌঁছে দেয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। বিবেকানন্দ এখানে সাধুরীতির আশ্রয় নিয়েছেন। কারণ তা তখনকার (১২৯৬ সাল) বাংলা সাহিত্যের বর্ণনার ভাষার প্রায়-একমাত্র বাহন। এবং মূলের ভাবগাম্ভীর্য তাঁকে

রক্ষা করতে হয়েছে বলেই এ ভাষা সংস্কৃত শব্দবহুল; তবুও তাঁর ব্যক্তিগত প্রবণতা মাঝে মাঝে সহজের দিকে ঝুঁকেছে। যেমন পঞ্চম পরিচ্ছদে — 'মানুষ চলিয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরের সত্য চিরকাল থাকে'। এ বাক্যে 'মনুষ্য'-এর স্থলে মানুষ' — এই শব্দের প্রয়োগ তাঁর কথ্যভঙ্গিকে স্মরণ করায়।

উল্লেখ্য যে, বিবেকানন্দের রচনায় 'বলিষ্ঠতা'র বিষয়টি তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন। সেই সাথে তাঁর নিজের অধ্যয়ন, কাশ্মীর হতে কন্যাকুমারিকা অবধি পর্যটন, উপলব্ধি, নানা ভাষা ও বিষয়ে গভীর জ্ঞান, সহজাত রঙ্গপ্রিয়তা — সবই এক প্রবল আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি নির্মাণ করেছে। এই আত্মবিশ্বাস এবং যা বলছেন সে বিষয়ে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব বা অধিকারের বোধ তাঁর রচনার বলিষ্ঠতার মূল। অর্থাৎ তাঁর ভাষা অর্জিত নেতৃত্বের ভাষা। তা তাঁর কথ্য[১৫] চলিত *পরিব্রাজক*, *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য* এবং সাধুরীতি *ভাববার কথা*, *বর্তমান ভারত* এবং মুদ্রিত কিছু ব্যক্তিগত পত্রে প্রকাশিত। এই নেতৃত্বের একটি দিক হলো মানুষকে উদ্বোধিত করা। তাঁর নিজস্ব রচনা দ্বারা এই কর্ম বিবেকানন্দ যেমন ভাবে করেছেন, তা অতুলনীয়। *বর্তমান ভারত* এর *স্বদেশমন্ত্র* শীর্ষক রচনা পর্যালোচনা করলে এই বিচিত্র ঊর্মি-আন্দোলন লক্ষ করি: 'হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরামুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা — এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে'? [এখানে তালিকাবদ্ধ অনর্গল ধিক্কার ও আক্রমণাত্মক অনুকম্পায় প্রশ্ন, পরের বাক্য তারই সমান্তরাল] 'এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে'? [এ বাক্যটি তুলনায় ছোট, এতে একটি সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়েছে] 'হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল — মুর্খ, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল আমার ভাই, ... [এখানে ক্রমোর্ধ্বগামী আবেগের মাত্রায় নতুন, গাঢ়তর বিধেয় যোগ হচ্ছে]

সাধু হোক, চলিত হোক — বিবেকানন্দের রচনা যে অনবদ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রাচীন গ্রিক ও লাতিন সাহিত্যে বাগ্মিতার যে শাস্ত্র (রেটোরিক) গড়ে উঠেছিল তার সাথে এবং পরে ইংরেজি, ফরাসি ইত্যাদি ভাষায় তার অনুসরণের সাথে বিবেকানন্দের সম্যক পরিচয় ছিল বলে বোঝা যায়। রচনাকে পাঠকের নিকট আকর্ষণীয় করার প্রয়োজনে সাজাতে হয়, শৈলীবিজ্ঞানের ভাষায়, Foregrounded বা 'প্রমুখিত' করতে হয়। অর্থকে তা আরো জোরালোভাবে প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এবার *ভাববার কথা*-র 'বর্তমান সমস্যা' প্রবন্ধ থেকে নাটকীয় বিরোধ নির্মাণ তুলে ধরি : 'ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণশক্তি-প্রধান; একের মূলমন্ত্র ত্যাগ, অপরের ভোগ; একের সর্বচেষ্টা অন্তর্মুখী, অপরের বহির্মুখী; একজন নিত্যসুখের আশায় ইহলোকের অনিত্য সুখকে উপেক্ষা করিতেছেন, অপর নিত্যসুখে সন্দিহান হইয়া বা দূরবর্তী জানিয়া যথাসম্ভব ঐহিক সুখলাভে সমুদ্যত। এ ধরনের দ্বিসম্ভব বা binary বিচারে কিছুটা সরলীকরণ ঘটতে বাধ্য (পরে প্রমথ চৌধুরীর লেখাতেও এ প্রকরণ আমরা দেখতে পাই)। কিন্তু উপায় হিসেবে এই Contrast বা বিরোধের দ্বারা বাক্যের

দুটি অংশ বা Clause-এ ভারসাম্য নির্মাণের মাঝে যে একটি চমৎকারিত্ব আছে, তা পাঠক বা শ্রোতাকে মোহিত না করে পারে না। উপরিউক্ত রচনাসমূহ ছাড়াও স্বামীজির রয়েছে সৃষ্টিশীল সাহিত্যসম্ভার। *কর্মযোগ* (১৮৮৭), *সংগীতকল্পতরু* (১৮৮৭), *রাজযোগ* (১৮৯৬), *লেকচার্স ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়া* (১৮৯৭), *মাই মাস্টার* (১৯০১), *বেদান্ত ফিলোসফি লেকচার্স অন জ্ঞানযোগ* (১৯০২) গ্রন্থসমূহ স্বামীজির সমৃদ্ধ লেখনীয় প্রতিভার পরিচয় বহন করে। এছাড়া তাঁর মরণোত্তরকালে প্রকাশিত হয় *দেববাণী* (১৯০৯), *ভক্তি প্রসংগে*, *প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত*, *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা* (১০ খণ্ড), *দি কমপ্লিট ওয়ার্কস অব স্বামী বিবেকানন্দ* (৯ খণ্ড); যা অগণিত সাহিত্যপিপাসু মানুষের মনের খোরাকে পরিণত হয়েছে। তিনি কবিতাও রচনা করেছেন, সংগীতজ্ঞ হিসেবেও রেখেছেন অবদান এবং কণ্ঠশিল্পী হিসেবে গেয়েছেন বিখ্যাত গান — 'খণ্ডন ভব বন্ধন' এবং 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি'। "সখার প্রতি" কবিতার অন্তিম দুটি চরণ — 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর/জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'; যা স্বামীজির বহুল-উদ্ধৃত একটি উক্তিও বটে। ফলে বিবেকানন্দের গদ্য কোথায় সাধু কোথায় চলিত — এ প্রসঙ্গ এক সময় গৌণ হয়ে যায়। একদিকে এই বহুপ্রতিভা মনীষায় যেমন তৎসম শব্দে বিদ্যাসাগরি বঙ্কিমি সমাস নির্মাণে অনর্গল দক্ষতা, চেনা শব্দকে মৌলিক বা ভিন্ন অর্থে প্রয়োগের সাহস (যৌন-বিবাহসংক্রান্ত, লিঙ্গ = চিহ্ন) তেমনি অন্যদিকে সাধুরীতির মধ্যেও ব্যক্তিগত সরসতা দিয়ে গাম্ভীর্যকে লঘুচালের রঙ্গে, ব্যঙ্গে, অট্টহাস্যে খানখান করা — কোনো কিছুরই অভাব নেই। তাই শেষতক বিবেকানন্দের গদ্য সম্বন্ধে আমাদের বলতেই হয় ecce homo — মানুষটিকে দেখ। আরেকটা সংকীর্ণ দিক হতে বেদনা হয় এই ভেবে যে, দীর্ঘায়ু পেলে এবং আরও বাংলা লেখার অবকাশ পেলে বাংলা ভাষা বিবেকানন্দের হাতে কত যে সমৃদ্ধ হতো! পরিশেষে বলব, স্বামীজির শিকাগো ভাষণ এবং রচনাসমূহ ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে; যার দ্বারা তিনি প্রাঞ্জলভাবে মানবসভ্যতার ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলো উল্লেখপূর্বক শান্তি ও সমন্বয়ের অনুপম দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন।

॥৩॥

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ভাষণ বর্তমান স্থানিক, কালিক ও বিশ্বযুগীয় সমসাময়িকতায় এক বিশিষ্টতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এই ভাষণের বিশিষ্টতার কারণ, এর সর্বজনীনতা। সমগ্র বিশ্বে আজ অশান্ত অবস্থা বিরাজমান। বিশ্বের সর্বত্রই আজ দেখা দিয়েছে স্বার্থের লড়াই, ভ্রান্ত আদর্শের রক্তক্ষয়ী সংঘাত। চারদিকের এই অবস্থা দেখে মনে হয় যে, ইতিহাসের এক ক্রান্তিকাল চলছে। এমন অস্বস্তিকর সময়ে শিকাগো ভাষণের মধ্যে আমরা পাই মানবতার জয়গান, যা এক বিপুল অনুপ্রেরণা। তিনি চেয়েছিলেন, আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজের নবকলেবর রচনা। জাতিকে তিনি সবল ও আত্মশ্রদ্ধাবান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দেশপ্রেমকে, আত্মোন্নতির প্রচেষ্টাকে

কোনো সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ করতে চাননি। বিবেকানন্দ আরও মনে করতেন, অতীতের গৌরববোধ থাকবে, কিন্তু সে গৌরব অহংকারের জনক হবে না। অস্পৃশ্যতা দূর হয়ে যেন এক মহাসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবীতে অস্তিত্বশীল ধর্মসমূহের অনুসারীগণের মাঝে আন্তঃসম্পর্কের উন্নয়ন এবং ভ্রাতৃত্বভাবপূর্ণ মিলনের আবশ্যকতা সকলের মানসপটে সুস্পষ্টভাবে এঁকে দেওয়াই ছিল তাঁর এ ভাষণের মূল লক্ষ্য। — স্বামীজি তাঁর এ ভাষণে একটি সর্বজনীন মহাধর্মের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি বলেন —

> যদি কখনো একটি সর্বজনীন ধর্মের উদ্ভব হয়, তবে তা কখনো কোনো দেশে বা কালে সীমাবদ্ধ হবে না; যে অসীম স্রষ্টার বিষয় ঐ ধর্মে প্রচারিত হবে, প্রত্যাশিত ঐ ধর্মকে তাঁরই মতো অসীম হতে হবে। সেই ধর্মের সূর্য কৃষ্ণভক্ত, খ্রিষ্টভক্ত, সাধু, অসাধু – সকলের উপর সমভাবে স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করবে। সেই ধর্ম শুধু ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান বা মুসলমান হবে না; স্বীয় উদারতাবশত সেই ধর্ম অসংখ্য প্রসারিত হস্তে পৃথিবীর সকল নর-নারীকে সাদরে আলিঙ্গন করবে, পশুতুল্য অতি হীন বর্বর মানুষ হতে শুরু করে হৃদয় ও মস্তিষ্কের গুণরাশির জন্য যাঁরা সমগ্র মানবজাতির ঊর্ধ্বে স্থান পেয়েছেন, সমাজ যাঁদেরকে সাধারণ মানুষ বলতে সাহস না করে সশ্রদ্ধ সভয় দৃষ্টিতে দেখেন – সেই সকল শ্রেষ্ঠ মানব পর্যন্ত সকলকেই স্বীয় অঙ্কে স্থান দেবে। সেই ধর্মের নীতিতে কারও প্রতি বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের স্থান থাকবে না; এতে প্রত্যেক নরনারীর দেবস্বভাব স্বীকৃত হবে এবং সমগ্র শক্তি মনুষ্যজাতিকে দেবস্বভাব উপলব্ধি করতে সহায়তা করার জন্যই সতত নিযুক্ত থাকবে।[১৬]

বিবেকানন্দ শিকাগো ভাষণ প্রদান করে যে সাফল্য পেয়েছিলেন তা কোনো ব্যক্তি বিশেষের নয়, তা নিখিল মানবাত্মারই সাফল্য। আর তিনি একজন ব্যক্তিমাত্র নন, বৈশ্বিক চেতনায় বিশ্ববিবেক। তাই আমাদের এ সময়ের মানবিক গুণের প্রসারতার জন্য, মানব উন্নয়নের জন্য, বিবেকানন্দের শিকাগো ভাষণ অধ্যয়ন, মনন, স্মরণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। 'বিবাদ নয় সহায়তা' — বিবেকানন্দের এই বাণীটি গ্রহণ করতে পারলে আমরা বিবেকবান হতে পারব নিঃসন্দেহে। আমরা কল্যাণ পথে যাত্রী হব অনন্তকাল ধরে।

টীকা

১. রেনেসাঁ (Renaissance) বলতে নবজাগরণ, নবচেতনা, পুনর্জাগরণ বোঝায়।

২. অসাধারণ প্রতিভা বা পাণ্ডিত্যের অধিকারী।

৩. বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) আধুনিক ভারতের একজন সন্ন্যাসী। তিনি কলকাতার এক উচ্চ মধ্যবিত্ত ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিবেকানন্দের পিতা বিশ্বনাথ ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের একজন স্বনামধন্য আইনজীবী এবং মাতা ভুবেনেশ্বরী দেবী। মায়ের প্রভাবেই বালক বিবেকানন্দ শিক্ষা ও ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হন। একজন তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন শিক্ষার্থী হিসেবে তিনি ১৮৮৪ সালে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৮৮৬ সালে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হতে সকল অস্তিত্বের একত্বের অনুভূতি লাভের সাথে ঘটে তাঁর দীক্ষায় সমাপ্তি। দ্রষ্টব্য, সিরাজুল ইসলাম [সম্পা] (২০০৩)। *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ১০। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা। পৃ. ৩১৭

৪. *The General Report of the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission,* (2012), RKM, Howrah, India, P.11

৫. ১৮১৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের কামারপুকুর গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন ক্ষুদিরাম চট্টোপ্রাধ্যায় এবং মাতা চন্দ্রমনি দেবী। তাঁর বাল্যনাম ছিল গদাধর। পরবর্তীকালে এই গদাধরই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নামে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি প্রচার করে গেছেন যত মত তত পথ। তিনি সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেছেন, তাঁর প্রিয় শিষ্য ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। দ্রষ্টব্য, ড. রামদুলাল রায়, (২০০৬) *বাঙালীর দর্শন*, প্রাচীনকাল থেকে সমকাল, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ২৮৪-২৮৫

৬. সন্ন্যাসী, অধিপতি, মালিক, মনিব, পতির উপাধিবিশেষ।

৭. ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে শিকাগোতে যে বিশ্বমেলা হয়েছিল, ধর্ম-মহাসভা সেই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলন।

৮. *স্বামীজীর শিকাগো ভাষণ* (১৯৯৩), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা। পৃ. ১

৯. Lakshmi Niwas Jhunj hunwala (2010), *The World Parliament of Religions, 1893*, Advaita Ashrama, Kolkata, পৃ. ৩

১০. *The Complete Works of Swami Vivekananda* (1984), Advaita Ashrama, Vol-3, Kolkata. (Hereafter *complete works*), পৃ. ৩৭

১১. *পূর্বোক্ত*

১২. *পূর্বোক্ত*

১৩. *Complete Works*, vol. 1, পৃ. ৫৬

১৪. *পূর্বোক্ত*

১৫. কথ্য ও চলিত ভাষার মধ্যে যে-পার্থক্য *চলন্তিকায়* রাজশেখর বসু করেছেন তা এই 'কথ্য' হলো ডায়ালেক্ট বা উপভাষা, বক্তার ঘর বা অঞ্চলের ভাষা; আর চলিত হল সর্ববঙ্গে গৃহীত মান্য বা প্রমিত মুখের ও লেখার বাংলা। বিবেকানন্দের বাংলা চলিত ভাষার আদলটিকে গ্রহণ ও সৃষ্টি করতে করতে এগিয়েছে, তবে কথ্যতা অর্থাৎ কলকাতার বুলিকে সম্পূর্ণ বর্জন করেনি।

১৬. *স্বামী বিবেকানন্দ* (২০১২), বাণী ও রচনা সংকলন, রামকৃষ্ণ মঠ, ঢাকা, পৃ. ৩৭

গ্রন্থপঞ্জি

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, (১৯৮৩)। *ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি*। নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা।

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ (১৪২০)। *বিবেকানন্দ রচনাসমগ্র*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, কামিনী প্রকাশনা, কলকাতা।

স্বামী অপূর্বানন্দ (১৯৮৯)। *যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ*, উদ্বোধন, কলকাতা।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৯৯৩)। *স্বামীজীর শিকাগো ভাষণ*, উদ্বোধন, কলকাতা।

Arvind Sharma (1988). *Swami Vivekananda's Experience*। Leiden, the Netherlands

Romain Rollan (1928). *The Life of Ramakrishna*. Twenty Second Reprint, 2010, Advaita Ashrama, Kolkata.

Swami Vivekananda, (1996). *My India: the India eternal* (1st ed.), Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta.

প্রাচীন ভারতে বিতর্কচর্চা

চন্দনা রাণী বিশ্বাস*

সারসংক্ষেপ : বিতর্ক মুক্ত জ্ঞানচর্চার অন্যতম মাধ্যম। একজন বিতার্কিক চান যুক্তির দ্বারা নিজ মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু ভিন্ন মতাবলম্বীকে তিনি কখনও আহত করেন না। প্রকৃত বিতার্কিক তাই পরমতসহিষ্ণু। আপন জ্ঞানের আলোয় যুক্তির বন্ধনে তিনি মুক্তি খুঁজে পান। বিতর্কচর্চার ইতিহাস অনেক প্রাচীন। বিতর্কচর্চা ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার একটি পুরাতন অনুশীলন। বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যাপৃত হয়ে আছে বিতর্কচর্চার বহু দৃষ্টান্ত। ভারতীয় দর্শনের সকল শাখাতে এই চর্চার রয়েছে ঈর্ষণীয় স্বাক্ষর। প্রত্যেক দর্শন চর্চাতেই রয়েছে একটি পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ। পূর্বপক্ষের আলোচনা-সমালোচনা করে উত্তরপক্ষ অর্থাৎ নিজপক্ষের মত প্রতিষ্ঠা করা ছিল সেকালের দর্শন চর্চার একটি রীতি। বিদ্বৎসমাজে, রাজসভায়, ধর্মীয়ক্ষেত্রে, যজ্ঞসভায় কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠানের বহু দৃষ্টান্তের পরিচয় পাওয়া যায় ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থাদিতে। পুরুষের পাশাপাশি নারীরও দীপ্র উপস্থিতি দেখা যায় বিতর্ক অঙ্গনে। বেদ-উপনিষদ থেকে আরম্ভ করে রামায়ণ-মহাভারত, ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যেও রয়েছে বিতর্কচর্চার গৌরবান্বিত ইতিহাস। এ সকল গ্রন্থ থেকে সেই বিতর্কধারার মহান ঐতিহ্য তুলে ধরার পাশাপাশি তা থেকে কোনো দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় কিনা সেটাই বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিতর্ক হলো শানিত যুক্তিতে উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে কোনো বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রক্রিয়া। বিতর্কের ইতিহাস মানব ইতিহাসের সমবয়সী। নিজের মত-পথকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সেই আদিম মানবও তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। অনুমান করা যায়, সেই যুদ্ধে বাচিকের সঙ্গে কায়িক এবং আস্ত্রিক শক্তিও যুক্ত হয়েছে। (অবশ্য বর্তমান সময়েও দেশ-বিদেশের সংসদীয় বিতর্কে বাচিকের সঙ্গে কায়িক শক্তির প্রয়োগ অদৃষ্ট নয়।) ধীরে ধীরে মানুষ পরিশীলিত হয়েছে, পরিশীলিত হয়েছে তার বাচিক বিষয়সমূহও। বিতর্কের নানা নিয়ম-কানুন প্রণীত হয়েছে। বিতর্ক পরিগণিত হয়েছে শিল্পরূপে। বিতর্ক হয়েছে জ্ঞানানুশীলনের একটি শাখা। সুপ্রাচীন কাল থেকে এদেশে বিতর্কের চর্চা হয়েছে। বৈদিক সাহিত্য থেকে শুরু করে সকল ভারতীয় দর্শনে বিতর্কচর্চা পরিদৃষ্ট। প্রাচীন ভারতে বিতর্ককে 'আন্বীক্ষিকী বিদ্যা' বলা হয়েছে। এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বা তর্কশাস্ত্রকে বলা হয়েছে সকল জ্ঞানের প্রদীপস্বরূপ। মানুষের পাণ্ডিত্য প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে বিতর্কচর্চা। এজন্য *বাৎস্যায়ন-ভাষ্যের* প্রথমেই বলা হয়েছে : 'প্রদীপঃ সর্বশাস্ত্রাণামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্। আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্তিতা'। অর্থাৎ এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা সকল শাস্ত্রের প্রদীপস্বরূপ, সকল কর্মের

* সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উপায়স্বরূপ এবং সকল ধর্মের আশ্রয়স্বরূপ। এজন্য চতুর্দশবিদ্যার মধ্যে এর বিশেষভাবে প্রশংসা করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের দার্শনিক কিংবা ধর্মপ্রচারকবৃন্দ তাঁদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তর্কবিদ্যার আশ্রয় নিতেন। কেননা যে কোনো মতবাদের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে হলে যদি সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহলে তর্কবিদ্যার সাহায্যেই তার উদ্‌ঘাটন এবং সন্দেহের নিরাকরণ করতে হয়। সুতরাং তর্কশাস্ত্রের উপযোগিতা অপরিসীম। ন্যায় দর্শনের দ্রষ্টা মহর্ষি গৌতম এ সম্পর্কে বলেছেন : "তত্ত্বাধ্যবসায়সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে বীজপ্ররোহসংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখাবরণবৎ"—

> আম্রাদিবৃক্ষের বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর বেড়ে না ওঠা পর্যন্ত তাকে গো-ছাগাদি পশুর হাত হতে রক্ষা করার জন্য যেমন কাঁটার বেড়া দেওয়া হয়, তেমনি বেদাদি শাস্ত্রসমূহের সিদ্ধান্তসমূহ হতে যাতে সাধারণ মানুষ বেদবিরোধীদের কুতর্কজালে আবদ্ধ হয়ে বিভ্রান্ত না হতে পারে, তার জন্য বেদবিরোধী মতবাদীগণের সাথে বিতর্ক করার প্রয়োজন আছে।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে বিতর্কচর্চার রয়েছে উজ্জ্বল ইতিহাস। বাচিক শক্তির নান্দনিক উপস্থাপনায় বিতর্কচর্চা হয়ে উঠেছিল ভারতীয় সংস্কৃতির এক অন্যতম বাহক। প্রাচীন ভারতে বিতর্কচর্চা কতটা সমৃদ্ধ ও শৈল্পিক ছিল তা আলোচ্য নিবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বৈদিক যুগ

বৈদিক যুগে ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, রাজসভায়, যজ্ঞসভায় বিতর্কের চর্চা ছিল। মূলত সেকালে বিতর্ক শিক্ষাদানের একটি বিশেষ অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হতো। শিক্ষা সংক্রান্ত নানা প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন : ধর্মীয়বোধ, নৈতিকতা, জীবনদর্শন প্রভৃতি মানবিক মূল্যবোধের পরিমাপক এবং যজ্ঞ সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে বিতর্ক হতো। বিতর্ক সভায় দুটো পক্ষ থাকত : পক্ষ ও প্রতিপক্ষ। বিতর্কে অংশগ্রহণকারী পক্ষ ও প্রতিপক্ষ পরস্পরের প্রতি প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্ন করতেন। বিচারকের দায়িত্ব কখনও একজন বা কয়েকজনের ওপর অর্পণ করা হতো। বিচারককে হতে হতো অবশ্যই পণ্ডিত, স্থিরচিত্ত ও নিরপেক্ষ। যেমন : রাজর্ষি জনক ছিলেন বহুগুণে গুণান্বিত একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর রাজসভায় প্রায়শ তিনি বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। তিনি হতেন এসব বিতর্ক অনুষ্ঠানের মাননীয় মডারেটর বা বিচারক। তিনি ছিলেন বিতর্কচর্চার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁর রাজসভায় বিতর্কানুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ বিতার্কিককে তিনি পুরস্কৃত করতেন।

বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে বিতর্কচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। *শুক্ল যজুর্বেদ* ও *তৈত্তিরীয় উপনিষদে* বিতর্কচর্চার বিভিন্ন কৌশল আলোচিত হয়েছে। এ গ্রন্থদ্বয়ে প্রথম প্রস্তাবকারীকে 'প্রশ্নিন্' এবং প্রতিবাদকারীকে 'অভিপ্রশ্নিন্' বলে অভিহিত করা হয়েছে। একজন বিতার্কিক হবেন অবশ্যই জ্ঞানপিপাসু। জ্ঞানার্জনের প্রতি তার থাকতে হবে প্রবল নিষ্ঠা। তাই তার্কিকেরা গ্রন্থপাঠের মাধ্যমে যেমন জ্ঞানার্জন করেন, আবার তত্ত্বজিজ্ঞাসু

হয়ে গুরু কিংবা কোনো জ্ঞানীজনের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। কিন্তু সে প্রশ্ন হতে হবে অবশ্যই সার্থক ও তর্কশাস্ত্রসম্মত। *কঠোপনিষদে* উল্লেখ আছে, যমদেব তত্ত্বজিজ্ঞাসু নচিকেতাকে সানন্দে বরণ করে নিয়েছিলেন এবং তিনি এমন সহস্র তত্ত্বজিজ্ঞাসু নচিকেতাকে প্রত্যাশা করেছেন — 'ত্বাদৃঙ্নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা' (*কঠোপনিষদ* ১/২/৯)। *শতপথব্রাহ্মণে* প্রাচীন ভারতের বিতর্কচর্চার বহু বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন : দেব-দেবীর সংখ্যা নিয়ে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ও শাকল্যের মধ্যে বিতর্ক (১১-৬-৩), উদ্দালক, আরুণি ও শৌচেয় প্রাচীনাযোগের মধ্যে (১১-৫-৩-১), আচার্য শাণ্ডিল্য ও তাঁর ছাত্র সাণ্ডরথ্যের মধ্যে, ঋগ্‌বেদীয় পুরোহিত 'হোতা' যজুর্বেদীয় পুরোহিত 'অধ্বর্যু'র মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা (১১-৫-২-১১); অশ্বমেধযজ্ঞ সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরোহিতের মধ্যে নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্কের বিবরণ প্রভৃতি। *শতপথ ব্রাহ্মণে* (১১-৬-২০) রাজর্ষি জনককে ব্রাহ্মণগণের তর্কে আহ্বান এবং ঋষি ও পরম জ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্যের তাঁদের প্রতি-উত্তর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আছে। *শতপথ ব্রাহ্মণে* উদ্দালক ও শ্বৈদায়নের কাহিনিতে জানা যায় যে, বিতর্কে প্রতিপক্ষের যুক্তির কাছে হেরে গিয়ে তাঁকে গুরুরূপে বরণ করার মধ্যে কোনো অসম্মান ছিল না। উদ্দালক ছিলেন কুরু–পাঞ্চালের এক ব্রাহ্মণ যুবক। কথিত আছে, তিনি একবার উত্তর ভারতে গিয়ে সভ্যগণের সামনে স্বর্ণ মুদ্রা ছুঁড়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গে বিতর্ক করার আহ্বান জানান। তখন উত্তর ভারতের সভ্যরা গৌতমপুত্র শ্বৈদায়নকে তাদের মুখপাত্ররূপে নির্বাচন করেন। শুরু হয় উদ্দালক ও শ্বৈদায়নের মধ্যে বাক্‌যুদ্ধ। উভয়ের মধ্যে যে তর্কযুদ্ধ হয় তাতে শ্বৈদায়ন উদ্দালককে পরাস্ত করেন; এর ফলে উদ্দালক বিজয়ী শ্বৈদায়নকে স্বর্ণমুদ্রা দান করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিতর্কের চর্চা কেবল ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; শিক্ষক, জ্ঞানী, মুনি-ঋষিগণসহ সমগ্র বিদ্বৎ সমাজ বিতর্কচর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

কেবল পুরুষ নয়; বৈদিক ভারতের বিদুষী নারীরাও বিতর্কচর্চায় রেখে গেছেন অনন্য অবদান। বিদুষী গার্গীর পাণ্ডিত্য আজও ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* বিদুষী গার্গী ও ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিতর্কের কাহিনি আমাদের বিস্ময়াভিভূত করে। রাজর্ষি জনকের রাজসভা। দূর-দূরান্ত হতে উপস্থিত হয়েছেন সে সময়ের বিখ্যাত জ্ঞানী মুনি-ঋষি ও পণ্ডিত সমাজ। কেননা মিথিলার রাজসভায় অনুষ্ঠিত হবে বিতর্কানুষ্ঠান। বিখ্যাত পণ্ডিত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি তর্কযুদ্ধে এক এক করে অশ্বল, আর্তভাগ, ভুজ্যু লাহ্যায়নি, উষস্ত চাক্রায়ণ, কহোল, কৌষীতকেয় প্রমুখ উপস্থিত ঋষিদের পরাস্ত করলেন। এবার মহীয়সী গার্গী প্রশ্ন করলেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে। প্রশ্নে-প্রতিপ্রশ্নে গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে তর্কযুদ্ধ চলল বহুক্ষণ। বিতর্কের বিষয় : আত্মতত্ত্ব। দুই মহান বিতার্কিক সমানে সমান। কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারলেন না। তখন বিচারক রাজর্ষি জনক তাঁদের উভয়কে সমান দক্ষ বলে ঘোষণা করলেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৪-২৫-৪) গন্ধর্ব-প্রভাবিত নামগোত্রহীন কুমারী এক বিদুষী নারীর বিতর্কের কথা উল্লেখিত আছে। অগ্নিহোত্র নামে প্রাত্যহিক হোমটি দুদিনে অথবা

একদিনে সম্পাদিত হবে কি না এ নিয়ে একবার পুরোহিতদের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হয়। একবার সকালে এবং আর একবার বিকালে প্রত্যহ দুবার ব্রাহ্মণদের অগ্নিহোত্র করতে হতো। প্রত্যূষের হোম ও সায়ন্তন হোম এভাবে ধরলে যাগটি একদিনে নিস্পাদ্য বলা যায়। আবার যদি আগের দিনের সায়ন্তন হোম হতে আরম্ভ করে পরবর্তী দিনের প্রভাতের হোম পর্যন্ত সময় গণনা করা যায়, তাহলে এ হোম দুদিনে নিস্পাদ্য বলে গণ্য হতে পারে। এই নিয়ে শুরু হলো মতবিরোধ। তখন ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ এই বিরোধের নিস্পত্তি করতে ওই অনামী বিদুষী নারীর নিকট উপস্থিত হলেন। তখন তিনি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আলোচনা করে দ্বিতীয় মতের পক্ষে যুক্তি দেখালেন। অর্থাৎ সায়ন্তন হোম সূর্যাস্তের পর এবং প্রত্যূষের হোম সূর্যোদয়ের পর প্রদত্ত হয় — এই মতকে তিনি যুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠা করলেন। বৈদিক ইতিহাসে তাই পুরুষের পাশাপাশি নারী বিতার্কিকও সমানভাবে দীপ্যমান।

রামায়ণ–মহাভারতের যুগ

অযোধ্যা নগরীর বিভিন্ন প্রবেশপথে যে সশস্ত্র বীর রক্ষীগণ অবস্থান করতেন, তাঁরা ছিলেন বিদ্যাবিচারে পারদর্শী অর্থাৎ তর্কপটু। তাঁরা তৎপর ও অস্ত্রপ্রয়োগে নিপুণ হলেও ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা অসহায় শত্রুকে এবং যাদের বাক্যের দ্বারা পরাজিত করা যায় — তাদের বাণের দ্বারা বিদ্ধ করতেন না।

যে চ বাণৈর্ন বিধ্যন্তি বিবিক্তমপরাপরম্ ।
শব্দবেধ্যঞ্চ বিততং লঘুহস্তা বিশারদাঃ ॥ আদিকাণ্ড.৫/২০

রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে তিনি দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। যজ্ঞকর্মের একটি অংশের সমাপ্তির পর অন্য অংশ আরম্ভের মধ্যবর্তী সময়ে শাস্ত্রালোচনা অনুষ্ঠিত হতো। মূলত বাগ্মী বিদ্বান বিতার্কিকগণ একে অপরকে জয় করার ইচ্ছায় পরস্পর প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্ন করতেন।

কর্মান্তরে তদা বিপ্রা হেতুবাদান্ বহূনপি।
প্রাহুঃ সুবাগ্মিনো ধীরাঃ পরস্পরজিগীষয়া ॥ আদিকাণ্ড. ১৪/১৯

এভাবে মূলত অশ্বমেধ যজ্ঞের পাশাপাশি বিতার্কিকগণ জ্ঞানযজ্ঞে অংশগ্রহণ করতেন।

শাস্ত্রানুমোদিত তর্কবিদ্যাকে মহাভারতে খুব উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন, 'বাদঃ প্রবদতামহম্' (ভীষ্মপর্ব.৩৪/৩২) — 'বিচারের মধ্যে আমি বাদস্বরূপ'। 'জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে' বর্ণিত হয়েছে, বেদান্তবিদ গন্ধর্ব বিশ্বাবসু মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে বেদ বিষয়ে চব্বিশটি এবং আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ তর্ক বিষয়ে একটি প্রশ্ন করেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য ক্ষণকাল দেবী সরস্বতীর ধ্যান করে উত্তর প্রদান করেন। তর্কবিদ্যার জ্ঞান রাজাদের পক্ষে অপরিহার্য ছিল। এ কারণে তর্কশাস্ত্রে জ্ঞান লাভের জন্য তাঁদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যরক্ষায় সুবিচারের প্রয়োজন। তর্কশাস্ত্রের

জ্ঞান না থাকলে বিচারপদ্ধতির সঙ্গে ভালোরূপে পরিচিত হওয়া যায় না। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম প্রমুখ ঋষিগণ তর্কশাস্ত্রে জ্ঞানার্জনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের মতে, তর্ক দ্বারা বিচার না করলে ধর্মের নির্ণয় হয় না। যে সকল মতবাদ হেতু ও আগমের অর্থাৎ স্মৃতি ও শ্রুতির বিরুদ্ধ নয়, সেগুলিই হবে তর্কের বিষয়। কিন্তু যা আর্যশাস্ত্রবিরোধী তা নিয়ে তর্ক করাকে নিন্দা করা হয়েছে। তাকে বলা হয়েছে অসাধু তর্ক। যাঁরা অসাধু হেতুর সাহায্যে সকল বিষয়েই বিরুদ্ধ তর্কের অবতারণা করে থাকেন, তাঁরাই হেতুদুষ্ট।

মহাভারতের যুগে বিতর্কচর্চার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় "বনপর্বের" ১১০তম অধ্যায়ে। রাজর্ষি জনকের রাজসভায় 'বন্দী' নামে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ছিলেন মিথিলার রাজসভার সভাপণ্ডিত। তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচারের উদ্দেশ্যে নানা দেশ হতে পণ্ডিতগণ মিথিলায় সমবেত হয়েছিলেন। বন্দী প্রত্যেক শাস্ত্রীয় বিচারে অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিষয় বিতর্কে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেন। মহর্ষি অষ্টাবক্র বারো বছর বয়সে মাতুল শ্বেতকেতুসহ জনকের সভায় শাস্ত্রবিচার করতে আসেন। কিন্তু দ্বাররক্ষক তাঁদের সভাপ্রবেশে বাধা দিলেন। তখন দ্বাররক্ষকের সঙ্গে মহর্ষি অষ্টাবক্রের বিদ্যাবিচার করতে হলো। লক্ষণীয়, মিথিলার রাজসভার দ্বারপালকও দক্ষ বিতার্কিক ছিলেন। রাজর্ষি জনকও দ্বাদশবর্ষী অষ্টাবক্রের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক করেছিলেন। তিনি অষ্টাবক্রের বিদ্যাবিচারের দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেন :

> হে ব্রাহ্মণকুমার! তোমাকে সামান্য মানুষ বলে বোধ হচ্ছে না। তুমি বালক নও। আমি তোমাকে বৃদ্ধ বলে জানলাম। বাক্যালাপে তোমার তুল্য কেউ নেই। তুমি বন্দীর সাথে শাস্ত্রবিচার শুরু করো। বন.১১০

সভাপণ্ডিত বন্দীর সঙ্গে অষ্টাবক্রের বিতর্কপর্ব শ্রুতিসুখকর ও জ্ঞানগর্ভ ছিল। শ্লোকের ছন্দে, সুরে, দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে তাঁরা পরস্পর কাব্যবিতর্ক করেছেন। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দ্বারা ছন্দোময় এ বিতর্ক। অনেকটা বর্তমানের কবিগানের লড়াইয়ের মতো। বিতর্ক শুরুর পূর্বে অষ্টাবক্র বন্দীকে বলেন :

> হে বন্দী! আমি যে কথা বলব, তুমি তার উত্তর দিবে এবং তুমি যে সকল বাক্য বলবে – আমিও তৎক্ষণাৎ উত্তর প্রদান করব। বন.১১০

বালক অষ্টাবক্রের সঙ্গে মিথিলার সভাপণ্ডিত বন্দীর শাস্ত্রীয় বিচার শুরু হলো। রাজসভায় বহু পণ্ডিত উপস্থিত। তাঁদের সামনে দু-জনে প্রশ্নে-প্রতিপ্রশ্নে এক অপরকে বিদ্ধ করে তুললেন।

বন্দী : এক এবাগ্নির্বহুধা সমিধ্যতে একঃ সূর্য্য সর্ব্বমিদং বিভাতি।
একো বীরো দেবরাজোঽরিহন্তা যমঃ পিতৃণামীশ্বরশ্চৈক এব ॥ বন.১১০/৮
– এক অগ্নি বহুপ্রকারে প্রদীপ্ত হন, এক সূর্য এই সমস্ত লোকে আলোক প্রদান করেন, এক বীর দেবরাজ অরিকুলের নিহন্তা এবং এক যম পিতৃগণের ঈশ্বর।

অষ্টাবক্র : দ্বাবিন্দ্রাগ্নী চরতো বৈ সখায়ৌ দ্বৌ দেবর্ষী নারদপর্ব্বতৌ চ।
দ্বাবশ্বিনৌ দ্বে রথস্যাপি চক্রে ভার্য্যাপতী দ্বৌ বিহিতৌ বিধাত্রা ॥ বন. ১১০/৯
– ইন্দ্র ও অগ্নি এই দুই সখা একত্র ভ্রমণ করেন, নারদ ও পর্বত এ দুজন দেবর্ষি, অশ্বিনীকুমারেরা দুজন, রথের চক্র দুটি, বিধাতৃবিহিত জায়া ও পতিও দুজন।

বন্দী : ত্রিঃ সূয়তে কর্ম্মণা বৈ প্রজেয়ং ত্রয়ো যুক্তা বাজপেয়ং বহন্তি।
অধ্বর্য্যবস্ত্রিসবনানি তন্বয়ে ত্রয়ো লোকাস্ত্রীণি জ্যোতীংষি চাহুঃ ॥ বন. ১১০/১০
– লোক স্ব স্ব কর্মানুসারে ত্রিবিধ জন্মগ্রহণ করে, তিন বেদ একত্র হয়ে সমস্ত বাজপেয় সুসম্পন্ন করে, অধ্বর্যুগণ ত্রিবিধ স্নানের বিধি বিধান করেন, লোক তিন প্রকার এবং জ্যোতিও ত্রিদিব।

অষ্টাবক্র : চতুষ্টয়ং ব্রাহ্মণানাং নিকেতং চত্বারো বর্ণা যজ্ঞমিমং বহন্তি।
দিশশ্চতস্রো বর্ণচতুষ্টয়ঞ্চ চতুষ্পদা গৌরপি শশ্বদুক্তা ॥ বন. ১১০/১১
– ব্রাহ্মণগণের আশ্রম চতুর্বিধ, চারবর্ণ জ্ঞানযজ্ঞের অধিকারী, চার দিক, বর্ণ চতুষ্টয় এবং গো চতুষ্পদা।

বন্দী : পঞ্চাগ্নয়ঃ পঞ্চপদা চ পঙ্‌ক্তির্যজ্ঞাঃ পঞ্চৈবাঽপ্যথ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি।
দৃষ্টা বেদে পঞ্চচূড়াঽপ্সরাশ্চ লোকে খ্যাতং পঞ্চনদঞ্চ পুণ্যম্ ॥ বন. ১১০/১২
– অগ্নি পঞ্চপ্রকার, পংক্তিচ্ছন্দ পঞ্চপদযুক্ত, যজ্ঞ পঞ্চবিধ, ইন্দ্রিয় পঞ্চ, বেদে অনুসন্ধানাত্মিকা চিত্তবৃত্তি পঞ্চপ্রকার এবং পবিত্র পঞ্চনদ লোকমধ্যে খ্যাত রয়েছে।

অষ্টাবক্র : ষড়াধানে দক্ষিণামাহুরেকে ষড়ু বৈ চেমে ঋতবঃ কালচক্রম্ ।
ষড়িন্দ্রিয়াণ্যুত ষট্ কৃত্তিকাশ্চ ষট্ সাদ্যস্কাঃ সর্ব্ববেদেষু দৃষ্টাঃ ॥বন. ১১০/১৩
– অগ্ন্যাধ্যানে দক্ষিণাস্বরূপ ছয়টি গো দান করা হয়, ঋতু ছয়, ইন্দ্রিয় ছয় ও কৃত্তিকা ছয় বলে বিখ্যাত আছে এবং ছয় সাদ্যস্কনামক যজ্ঞ সর্ববেদেই বিহিত আছে।

বন্দী : সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ সপ্ত বন্যাঃ সপ্ত চ্ছন্দাংসি ক্রতুমেকং বহন্তি।
সপ্তর্ষয়ঃ সপ্ত চাপ্যর্হণানি সপ্ততন্ত্রী প্রথিতা চৈব বীণা ॥ বন. ১১০/১৪
– গ্রাম্য পশু সপ্তবিধ, বন্যপশু সপ্তবিধ, সপ্ত ছন্দ এক যজ্ঞ সম্পন্ন করে, সপ্তর্ষিমণ্ডল লোকে বিখ্যাত, অর্হণা সপ্তপ্রকার ও বীণা সপ্ততন্ত্রী।

অষ্টাবক্র : অষ্টৌ শাণাঃ শতমানং বহন্তি তথাঽষ্টাপাদঃ শরভঃ সিংহঘাতী ।
অষ্টৌ বসূন্ শুশ্রুম্ দেবতাসু যূপশ্চাষ্টাস্রির্বিহিতঃ সর্ব্বযজ্ঞে ॥ বন. ১১০/১৫
– আটটি গোণী শত-পরিমিত দ্রব্য ধারণ করে, অষ্টপাদ শরভ সিংহকে বিনষ্ট করে থাকে, দেবগণের মধ্যে আটজন বসু প্রসিদ্ধ আছেন এবং অষ্টকোণবিশিষ্ট যূপ সর্বযজ্ঞেই বিহিত হয়ে থাকে।

বন্দী : নবৈবোক্তাঃ সামিধেন্যঃ পিতৃণাং তথা প্রাহুর্নবযোগং বিসর্গম্ ।

নবাক্ষরা বৃহতী সম্প্রদিষ্টা নবৈব যোগো গণনামেতি শশ্বৎ ॥ বন.১১০/১৬

– পিতৃযজ্ঞে সামধেনী মন্ত্র নববিধ ও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি অবান্তর-গুণভেদে নয় প্রকার হয়ে বিবিধ সৃষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে, বৃহতী নবাক্ষরা ও একাদি নয় পর্যন্ত নয়টি অঙ্কদ্বারা সমুদয় গণনা সম্পন্ন হয়ে থাকে।

অষ্টাবক্র : দিশো দশোক্তাঃ পুরুষস্য লোকে সহস্রমাহুর্দশ পূর্ণং শতানি।

দশৈব মাসান্ বিভ্রতি গর্ভবত্যো দশেরেকা দশ দাশা দশার্হাঃ ॥ বন. ১১০/১৭

– দশ দিক, শত সংখ্যা দশগুণিত হলে সহস্র হয়, স্ত্রীগণ দশমাস গর্ভধারণ করে থাকে, দশজন তত্ত্বের উপদেষ্টা ও দশজন অধিকারী।

বন্দী : একাদশৈকাদশিনঃ পশূনামেকাদশৈবাত্র ভবন্তি যূপাঃ।

একাদশ প্রাণভৃতাং বিকারা একাদশোক্তা দিবি দেবেষু রুদ্রাঃ ॥ বন. ১১০/১৮

– প্রাণীগণের ইন্দ্রিয়বিষয় একাদশ, সেই একাদশ বিষয়ই তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, ইন্দ্রিয়বিকার একাদশ প্রকার ও স্বর্গে একাদশ রুদ্র সুপ্রসিদ্ধ আছেন।

অষ্টাবক্র : সংবৎসরং দ্বাদশমাসমাহুর্জগত্যাঃ পাদো দ্বাদশৈবাক্ষরাণি।

দ্বাদশাহঃ প্রাকৃতো যজ্ঞ উক্তো দ্বাদশাদিত্যান্ কথয়ন্তীহ ধীরাঃ ॥ বন. ১১০/১৯

– দ্বাদশ মাসে সংবৎসর হয়, জগতী ছন্দের প্রত্যেক পাদে দ্বাদশ অক্ষর, প্রাকৃত যজ্ঞ দ্বাদশ দিনে সম্পন্ন হয়, দ্বাদশ আদিত্য ত্রিলোকবিখ্যাত।

বন্দী : ত্রয়োদশী তিথিরুক্তা প্রশস্তা ত্রয়োদশদ্বীপবতী মহী চ। বন.১১০/২০

– ত্রয়োদশী তিথি প্রশস্ত বলে উক্ত আছে ও পৃথিবী ত্রয়োদশ দ্বীপবিশিষ্ট।

বন্দী এক পর্যায়ে অসম্পূর্ণ বাক্য বলে বিরত হলেন। তাঁকে অধোমুখে চিন্তাপর দেখে অষ্টাবক্র বন্দীর অসম্পূর্ণ বাক্য পূরণ করে বললেন : 'ত্রয়োদশাহানি সসার কেশী ত্রয়োদশাদীন্যতিচ্ছন্দাংসি চাহুঃ' ॥ বন.১১০/২০ অর্থাৎ, আত্মা বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধস্বরূপ ত্রয়োদশ প্রকার ভোগে আসক্ত হন ও ধর্মাদি সমুদয় বুদ্ধ্যাদি ত্রয়োদশের নাশক।

অবশেষে বিদ্যাবিচারে বালক অষ্টাবক্রের কাছে সভাপণ্ডিত বন্দী পরাজিত হলেন। তখন উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ সশ্রদ্ধচিত্তে দ্বাদশবর্ষী জ্ঞানবৃদ্ধ বিতার্কিক অষ্টাবক্রের পূজা করলেন। মূলত সে সময় যিনি তাঁর পাণ্ডিত্য শাস্ত্রবিচারে নিঁখুতভাবে প্রকাশ করতে পারতেন তিনিই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হিসেবে পরিগণিত হতেন।

শান্তিপর্বের ৩১০তম অধ্যায়ে *ধর্ম্মধ্বজ-সুলভা সংবাদে* বিদুষী সুলভার বাগ্মিতা আমাদের মুগ্ধ করে। তিনি ছিলেন সন্ন্যাসিনী। রাজর্ষি ধর্ম্মধ্বজের তত্ত্বজ্ঞানের কথা শুনে বিদ্যাবিচারের উদ্দেশ্যে তিনি মিথিলা নগরে উপস্থিত হন। গৃহস্থের মোক্ষধর্ম নিয়ে তাঁদের মধ্যে শাস্ত্রালোচনা শুরু হলো। প্রথমেই রাজর্ষি ধর্ম্মধ্বজ গৃহস্থের মোক্ষধর্ম নিয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করলেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্য ছিল অনেকটা স্থূলদর্শী এবং আক্রমণাত্মক। এখানে তাঁর বক্তব্যের কিছু অংশ তুলে ধরা হলো —

ন ময়েবোভিসন্ধিস্তে জয়ৈষিণ্যা জয়ে কৃতঃ।
যেয়ং মৎপরিষৎ কৃৎস্না জেতুমিচ্ছসি তামপি ॥
তথার্হতস্ততশ্চ ত্বং দৃষ্টিং স্বাং প্রতিমুঞ্চসি।
এৎপক্ষপ্রতিঘাতায় স্বপক্ষোদ্ভাবনায় চ ॥ শান্তি.৩১০/৬৬-৬৭

...তুমি জয়লাভার্থী হয়ে কেবল আমাকে নয়; আমার সভাস্থ মহাত্মাদেরও পরাজিত করতে বাসনা করেছ। তুমি আমার সভাস্থ পূজ্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে মনে হচ্ছে, আত্মপক্ষের উন্নতি ও আমার পক্ষের অপকর্ষ সাধনই তোমার উদ্দেশ্য। তুমি আমার উন্নতি দর্শনে ঈর্ষান্বিত...।

মিথিলাধিপতির এরূপ শ্রুতিকটু ও অযৌক্তিক বাক্যে সন্ন্যাসিনী সুলভা বিরক্ত হলেন না। বরং তিনি মধুর বাক্যে রাজর্ষিকে বললেন –

নবভির্নবভিশ্চৈব দোষৈর্বাক্‌বুদ্ধিদূষণৈঃ।
অপেতমুপপন্নার্থমষ্টাদশগুণান্বিতম্ ॥
সৌক্ষ্ম্যং সাংখ্যক্রমৌ চোভৌ নির্ণয়ঃ সপ্রয়োজনঃ।
পঞ্চৈতান্যর্থজাতানি বাক্যমিত্যুচ্যতে নৃপ ॥শান্তি.৩১০/৭৮-৭৯

– রাজা! জ্ঞানীরা একেই বাক্য বলেন – যাতে বাক্য ও বুদ্ধির দোষজনক অষ্টাদশপ্রকার দোষ না থাকে, অর্থসঙ্গত হয়, অষ্টাদশ প্রকার গুণ থাকে এবং দুর্বোধ্যতা, সংখ্যা, ক্রম, নির্ণয় ও প্রয়োজন – এই পঞ্চবিধ অর্থ থাকে।

এষামেকৈকশোঽর্থানাং সৌক্ষ্ম্যাদীনাং সলক্ষণম্ ।
শৃণু সংসার্য্যমাণানাং পদার্থপদবাক্যতঃ ॥
জ্ঞানং জ্ঞেয়েষু ভিন্নেষু যদা ভেদেন বর্ত্ততে।
তত্রাতিশায়িনী বুদ্ধিস্তৎসৌক্ষ্ম্যমিতি বর্ত্ততে ॥ শান্তি.৩১০/৮০-৮১

– পদ, বাক্য, পদার্থ ও বাক্যার্থ অনুসারে আমি এই সৌক্ষ্ম্যপ্রভৃতি এক একটি বিষয়ের লক্ষণ বর্ণনা করছি, আপনি শ্রবণ করুন। যে স্থলে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে 'এই ঘট এই পট' এরূপ ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান হয়, সে স্থলে একতম বিষয়া যে বুদ্ধি হয়, তাই সৌক্ষ্ম্য।

দোষাণাঞ্চ গুণানাঞ্চ প্রমাণং প্রবিভাগতঃ।
কঞ্চিদর্থমভিপ্রেত্য সা সংখ্যেত্যুপধার্য্যতাম্ ॥
ইদং পূর্ব্বমিদং পশ্চাদ্‌বক্তব্যং যদ্বিবক্ষিতম্ ।
ক্রমযোগং তমপ্যাহুর্বাক্যং বাক্যবিদো জনাঃ ॥
ধর্ম্মকামার্থমোক্ষেষু প্রতিজ্ঞায় বিশেষতঃ ।
ইদং তদিতি বাক্যান্তে প্রোচ্যতে স বিনির্ণয়ঃ॥
ইচ্ছাদ্বেষভবৈর্দুঃখৈঃ প্রকর্ষো যত্র জায়তে ।
তত্র যা নৃপতে! বৃত্তিস্তৎপ্রয়োজনমিষ্যতে ॥ শান্তি. ৩১০/৮২-৮৫

— মহারাজ! বক্তব্য বাক্য অষ্টাদশ দোষশূন্য ও অষ্টাদশ গুণযুক্ত হওয়া আবশ্যক। সৌক্ষ্ম্য, সাঙ্খ্য, ক্রম, নির্ণয় ও প্রয়োজন এই পঞ্চাঙ্গযুক্ত পদসমূহকেই বাক্য বলে নির্দেশ করা হয়। তার মধ্যে যা সংশয়সূচক, তার নাম সৌক্ষ্ম্য। যার দ্বারা গুণদোষ সংখ্যা করা যায়, তার নাম সাঙ্খ্য। যা দ্বারা অগ্রপশ্চাৎক্রমে কোনটি আগে ও কোনটি পরে নিরূপিত হয় — তা ক্রম। পূর্বপক্ষের পর বিচারান্তে যা সিদ্ধান্ত হয়, তার নাম নির্ণয়। ঔৎসুক্য ও দ্বেষনিবন্ধন কর্তব্যাকর্তব্যে যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জন্মে — তার নাম প্রয়োজন।

বিদুষী সুলভার বক্তব্যে আদর্শ বিতার্কিকের বাগ্‌ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত – তা ফুটে উঠেছে। আবার বিতার্কিক কোন্ ধরনের বাক্যপ্রয়োগে বিরত থাকবেন, সে সম্পর্কেও বিদুষী সুলভা তাঁর বক্তব্য চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। সাংখ্য-যোগদর্শনে তাঁর ছিল গভীর পাণ্ডিত্য। বাচিক শক্তির শৈল্পিক উপস্থাপনায় তিনি রাজর্ষির প্রত্যেক প্রশ্নের চমৎকার সমাধান দিয়েছেন। এক পর্যায়ে রাজর্ষি ধর্ম্মধ্বজ মনস্বিনী সুলভার সার্থক ও হেতুগর্ভ বাক্যের কিছুই প্রত্যুত্তর দিতে পারলেন না। বাগ্মী-বিদুষী-বিতার্কিক সুলভা দেবীর জয় হলো। তাই বলা যায়, মহাভারতের যুগে পুরুষের পাশপাশি বিতর্কে নারীরাও অংশগ্রহণ করতেন। কখনওবা বিদুষী নারী শ্রেষ্ঠ বিতার্কিক রূপে জয়ী হতেন। সুলভা দেবী তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ভারতীয় দর্শন বিতর্ক

প্রাচীন ভারতে বিতর্কচর্চার পথকে উন্মুক্ত করেছে ভারতীয় দর্শনগুলো। ভারতীয় দর্শন যুক্তি ও বিচারবাদী। ষড়দর্শনে মহর্ষি কপিল সাংখ্য দর্শনের, পতঞ্জলি যোগ দর্শনের, অক্ষপাদ গৌতম ন্যায় দর্শনের, মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক দর্শনের, মহর্ষি জৈমিনি পূর্ব মীমাংসার এবং বেদব্যাস উত্তর মীমাংসার প্রণেতা। বিভিন্ন দার্শনিক সংক্ষিপ্ত সূত্রের মাধ্যমে তাঁদের দার্শনিক চিন্তাধারাকে প্রকাশ করায় সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। তাই ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যকার এসব দর্শনের ভাষ্য রচনা করেছেন। আবার এসব ভাষ্যের বহু টীকা, টিপ্পনী, বার্ত্তিক রচিত হয়েছে। এভাবে চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, বেদান্ত প্রভৃতি মতবাদীরা নিজেদের স্বাধীনচিন্তা ও মতবুদ্ধির সাহায্যে নিজ নিজ দার্শনিক মতগুলো গঠন করেছেন। মূলত যুক্তির আলোকে তাঁরা তাঁদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গৌতম বুদ্ধ শিষ্যদের বলেছেন :

> "অন্তদীপা বিহরণ অত্তশরণা অনঞ্ঞশরণা"– সত্য নির্ধারণের পথে তোমরা অন্যের শরণ নিও না, নিজের বিচার-বুদ্ধির ওপর নির্ভর করো, অন্তরের বিচার-বুদ্ধির আলোতে সত্যকে সন্ধান করো।

ভারতীয় দার্শনিকগণ বিচার ব্যতীত কোনো মত গ্রহণ করেননি। তাঁরা কোনো সমস্যা সম্পর্কে নিজের মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার আগে ওই সমস্যা সম্পর্কে অন্য দার্শনিকদের মতবাদও বিচার করে দেখেছেন। যদি সেক্ষেত্রে তাঁর নিজের মতবাদ তার কাছে যুক্তিগ্রাহ্য না হয়, তখন অপরের যুক্তিগ্রাহ্য মতকে নির্দ্বিধায় সানন্দে গ্রহণ করেছেন। মূলত ভারতীয় দার্শনিকেরা যুক্তির আলোয় মুক্তি খুঁজে যা যুক্তিযুক্ত তাকেই গ্রহণ করেছেন।

আবার বিতর্ককে শৈল্পিক ও আকর্ষণীয় করার জন্য প্রাচীন ভারতের অনেক দার্শনিক বিতার্কিক তাঁদের গ্রন্থে বিস্তর আলোচনা করেছেন। কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত যুক্তির আলোকে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসার করেছিলেন। নাগার্জুন (খ্রি: ৩০০) নালন্দা বিহারের পণ্ডিতদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন বিখ্যাত বিতার্কিক ও মাধ্যমিক

দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর রচিত *উপায়কৌশল্যহৃদয়শাস্ত্র* গ্রন্থে বিতর্কশিল্পের কৌশল এবং সাধনোপায় যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রন্থটি ৪২৭ খ্রিষ্টাব্দে চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এ গ্রন্থে চারটি অধ্যায় রয়েছে। সেগুলো হলো —

বাদ-বিশদীকরণ, নিগ্রহস্থান, তত্ত্ব-ব্যাখ্যান এবং জাতি (অসদুত্তর)।

ক. বাদ-বিশদীকরণ : এ অধ্যায়কে আটটি বিষয়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথা : উদাহরণ, সিদ্ধান্ত, বাক্য-প্রশংসা, বাক্যদোষ, হেতুজ্ঞান, সময়োচিত বাক্য, হেত্বাভাস ও দুষ্ট বাক্যানুসরণ।

খ. নিগ্রহস্থান : এর অপর নাম পরাজয়স্থান। এ অধ্যায়কে নয়টি পরাজয়ের ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যথা : অবিজ্ঞাতার্থ, অপ্রতিভা, অননুভাষণ, ন্যূন, অধিক, নিরর্থক, অপ্রাপ্তকাল, অপার্থক এবং প্রতিজ্ঞাহানি।

গ. তত্ত্ব-ব্যাখ্যান : এই অধ্যায়ে বিভিন্ন মতাদর্শ কীভাবে বর্ণিত হয় – তা দেখানো হয়েছে। এর অপর নাম মতানুজ্ঞা।

ঘ. জাতি : এ অধ্যায়ে বর্ণিত জাতি বা অসৎ উত্তরের বিভিন্ন শ্রেণির উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো : উৎকর্ষ-সমা, অপকর্ষ-সমা, অবর্ণ-সমা, অহেতু-সমা, প্রাপ্তি-সমা, অপ্রাপ্তি-সমা, সংশয়-সমা এবং প্রতিদৃষ্টান্ত-সমা ইত্যাদি।

নাগার্জুনের শিষ্য আর্যদেব। তিনিও ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত ও নালন্দার অধ্যাপক। তিনি বহুদেশ ভ্রমণ করেন এবং বিতর্কের মাধ্যমে আলোচনায় বহু তার্কিককে পরাজিত করেন। *ভ্রমপ্রমথনযুক্তিহেতুসিদ্ধি* আর্যদেবের বিখ্যাত গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি প্রতিপক্ষের মতামতকে ভুল প্রমাণ করে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর্য আসংগ ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসুবন্ধু বিখ্যাত পণ্ডিত, গ্রন্থকার ও তার্কিক ছিলেন। বসুবন্ধু রচিত *তর্কশাস্ত্র* প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র গ্রন্থ।

বসুবন্ধুর শিষ্য দিঙনাগ (খ্রি. ৪০০) ছিলেন বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের উদ্গাতা, তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত। তর্কে তিনি বহু পণ্ডিতকে পরাজিত করেন। তিনি নালন্দা, উড়িষ্যা ও মহারাষ্ট্র পরিভ্রমণ করেন এবং প্রবল তর্কশক্তিতে অপরাজেয় হওয়ায় 'তর্কপুঙ্গব' উপাধি লাভ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী সময়েও হিন্দুশাস্ত্রকারগণ তাঁর মত খণ্ডন করতে বহু আয়াস করেছেন। উদ্দ্যোতকর, কুমারিল ভট্ট, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিত তাঁর মত নিরসন করতে চেষ্টা করেছেন। দিঙনাগের 'প্রমাণসমুচ্চয়' কারিকাগুলি বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থ। তিনি হিন্দুর ন্যায়-ভাষ্যকার বাৎস্যায়নকে সমালোচনা করেছেন।

ধর্মকীর্তি (৬১৫-৬৫০ খ্রি.) বৌদ্ধদর্শনের একজন বিখ্যাত বিতার্কিক ছিলেন। প্রবাদ আছে, ধর্মকীর্তি কুমারিল ভট্টের ভক্তগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে গোপনে কুমারিলের জ্ঞানভাণ্ডার আত্মসাৎ করেন। তিনি কুমারিলের জ্ঞানলাভ করে কুমারিল ভট্টের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করেন। ধর্মকীর্তি নির্গ্রন্থদের (জৈনাচার্য) তর্কে পরাজিত করে দক্ষিণ দেশে স্বীয় মত প্রবর্তন করেন। তাঁর রচিত *প্রমাণবার্তিককারিকা*, *ন্যায়বিন্দু*, ও *বাদন্যায়* তর্ক সম্পর্কিত বিখ্যাত গ্রন্থ।

শান্তরক্ষিত (৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত) বাংলাদেশের ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাভার (জুহোর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধদর্শনের একজন বড় মাপের বিতার্কিক। তাঁর রচিত 'তত্ত্বসংগ্রহ' কারিকাগুলিতে তিনি অন্যান্য ধর্ম বা দার্শনিক মত খণ্ডন করেছেন।

কমলশীল (৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগ) ছিলেন শান্তরক্ষিতের শিষ্য ও নালন্দার অধ্যাপক। তিনি তাঁর গুরুর রচিত গ্রন্থ *তত্ত্বসংগ্রহের* ব্যাখ্যা 'তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা' প্রণয়ন করেন। শান্তরক্ষিত যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম করেননি এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর মূল গ্রন্থ হতে তর্কপূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করেননি, সেখানে কমলশীল প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম ও তর্কিত অংশগুলির উল্লেখ করে পূর্ণরূপ দিয়েছেন।

খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে মিথিলার বিখ্যাত পণ্ডিত গঙ্গেশ 'তত্ত্বচিন্তামণি' রচনা করে নব্যন্যায়ের সূত্রপাত করেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত তার্কিক। পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্র (খ্রি. ১২৭৫) তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। পক্ষধর এক পক্ষকালব্যাপী আলোচনা সভায় অনেক তার্কিককে পরাজিত করে জয়ী হয়ে 'পক্ষধর' উপাধি লাভ করেন।

সপ্তদশভূমিশাস্ত্রযোগাচার্য গ্রন্থের রচয়িতা আচার্য মৈত্রেয়নাথ। এ গ্রন্থটি আনুমানিক ৪০০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়। গ্রন্থটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। বিতর্কের বিভিন্ন কৌশল এ গ্রন্থে চমৎকারভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বিতর্ক সম্পর্কে আচার্য মৈত্রেয়ের নির্দেশনাগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো —

(১) বিতর্কের বিষয় : বিতর্কের বিষয় বিতার্কিক ও শ্রোতাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বিতর্কের বিষয় প্রয়োজনীয় হতে হবে।

(২) বিতর্কের স্থান : বিতর্ক বাদী-বিবাদী সাপেক্ষ। তাই বিতর্কে জয়-পরাজয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জ্ঞানী-গুণী সম্মেলনে, রাজা অথবা অমাত্যের সভাকক্ষে বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

(৩) বিতর্কের সাধন বা উপায় : বিতর্কের প্রতিষ্ঠাতব্য বিষয়কে বলা হয় সাধ্য। সাধ্যের উপস্থাপনের জন্য মৈত্রেয়নাথ নিম্নোক্ত আটটি বিষয় সহায়করূপে বর্ণনা করেছেন। যথা- সিদ্ধান্ত, হেতু, উদাহরণ, সাধর্ম্য, বৈধর্ম্য, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। স্বমত স্থাপনের বেলায় উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্য বিষয়কে তুলে ধরতে হয়। বাদী ও প্রতিবাদী আত্মপক্ষ উপস্থাপনের বেলায় প্রতিজ্ঞা ও হেতুবাক্য বললে মধ্যস্থদের প্রশ্নানুসারে পরে উদাহরণবাক্য বলতে বাধ্য হন। এই উদাহরণ সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য বা ইতিমুখে ও নেতিমুখে হতে পারে। যেমন : নৈয়ায়িক বললেন শব্দ হলো অনিত্য, কারণ শব্দের উৎপত্তি আছে। এই দুটি বচন বলেই নৈয়ায়িক ক্ষান্ত হলেন না। তিনি বললেন– "যো য উৎপত্তিমান্ স সোঽনিত্যঃ। যথা মৃন্ময়ো ঘটঃ"– পৃথিবীতে যে যে বস্তুরই উৎপত্তি হয়, সেই সেই বস্তুরই বিনাশ হয়। যেমন- মৃন্ময় ঘট। অথবা "যো যো ন অনিত্যঃ স ন উৎপত্তিমান্, যথা– আত্মা" — অথবা যেগুলি অনিত্য নয়, সেগুলি উৎপত্তিশীল নয়। যথা- আত্মা। মৈত্রেয়নাথের মতে, বিতার্কিককে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমে দক্ষ হতে হবে।

(৪) বিতার্কিকের যোগ্যতা : মৈত্রেয়নাথ বিতার্কিকের যোগ্যতা নির্ণায়ক আলোচনায় পাঁচটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সেগুলো হলো —

ক. তর্কে অংশগ্রহণকারী অবশ্যই পক্ষ-প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য উত্থাপনের যোগ্য বিষয়গুলো সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবহিত থাকবেন।

খ. তর্কে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি কোনো পরিস্থিতিতেই একে অন্যের বিরুদ্ধে অসম্মানজনক, কুরুচিকর, অশালীন শব্দ প্রয়োগ করবেন না। কথায় কথায় সম্বোধনকালে মর্যাদাপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করবেন। এখানে স্মর্তব্য শ্রীহর্ষের একটি উক্তি। আচার্য শ্রীহর্ষ তাঁর 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্' গ্রন্থে বলেছেন : 'ব্যবহারনিয়মেন সময়ং বদ্ধা প্রবর্তিতায়াং কথায়াম্'– কতকগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম পালনে প্রতিশ্রুত হয়ে তবেই বিচারে প্রবৃত্ত হতে হয়। কারণ বাদী-প্রতিবাদীর ভাষা ব্যবহারে অসতর্কতা থেকেই বিতর্কসভায় চরম হট্টগোলের সূত্রপাত হয়।

গ. বিতার্কিক নির্ভীক ও আত্মবিশ্বাসী হবেন। নিঃশঙ্কচিত্তে তিনি নিজের বিশ্বাসের সপক্ষে বক্তব্য রাখবেন। বক্তব্য পরিবেশনের সময় হাত-পায়ে কম্পন, শৈত্যানুভব, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, বুক ধড়ফড় জাতীয় স্নায়ুবৈকল্যের দ্বারা তিনি বশীভূত হবেন না।

ঘ. বিতর্ক কোনো মুখস্থবিদ্যা নয়। বক্তব্য পরিবেশনের সময় বাদী-বিবাদীকে তাই নিরবচ্ছিন্নভাবে নিজের বক্তব্য রাখতে হবে। মুখস্থ বলতে বলতে বক্তা যদি অনবধানতাবশত ভুলে যায়, আবার বলে, আবার ভোলে – এরকম ঘটনা বিতর্কশিল্পে গ্রহণযোগ্য নয়। বিতার্কিকের বক্তব্য উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে যেন সহজবোধ্য হয়।

ঙ. বিতার্কিকের বাচনভঙ্গি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বিতার্কিক নানা ভঙ্গিমায় তাঁর কণ্ঠস্বর ব্যবহার করবেন।

(৫) নিগ্রহস্থান বা পরাজয়ের ক্ষেত্র : মৈত্রেয়নাথ তিন ধরনের নিগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন :

ক. যদি বিতার্কিক প্রথমে কোনো বিষয়ের বিরোধিতা করে পরে সেই বিরুদ্ধ বিষয়ের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন।

খ. যদি বিতার্কিক নিজের প্রস্তাবিত বিষয়কে ঠিকভাবে উপস্থাপন করতে না পেরে বিষয়ান্তরকে গ্রহণ করেন।

গ. যদি বিতার্কিক অপ্রাসঙ্গিক অতীত বাক্য বলতে থাকেন — তবে তিনি নিগৃহীত বা পরাজিত হবেন।

(৬) বিতর্কসভায় উপস্থিতির প্রাসঙ্গিকতা : বিতর্কসভায় উপস্থিতির পূর্বে বাদী-বিবাদী উভয়কে অবশ্যই বিতর্কের বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে যে, বিদ্যা বিচারের বিষয়টি সবার জন্য কতটা প্রাসঙ্গিক বা প্রয়োজনীয়। অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে বিদ্যাবিচার করা অর্থাৎ বিতর্ক করা ঠিক নয়।

(৭) বিতার্কিকের সাহসিকতা বা আত্মপ্রত্যয় : বিতার্কিক সাহসের সঙ্গে নিজের বক্তব্যকে উপস্থাপন করবেন। দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে নিজের মতাদর্শকে তিনি এমনভাবে উপস্থাপন করবেন যেন তার জয় নিশ্চিতপ্রায়। বিতার্কিকের বক্তব্যে শ্রোতৃমণ্ডলী তথা মধ্যস্থতাকারী বিচারক যেন বক্তার পাণ্ডিত্য সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হন।

প্রাচীন ভারতে বিতর্কচর্চায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে নৈয়ায়িক সম্প্রদায়। মহর্ষি গৌতমের 'ন্যায়সূত্র' ন্যায়দর্শনের মূলগ্রন্থ। বাৎসায়নের ' ন্যায়ভাষ্য' ন্যায়দর্শনের একটি প্রাচীন গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি নাগার্জুনের মাধ্যমিকবাদ খণ্ডন করেছেন। উদ্দ্যোতকর একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ও বিতার্কিক ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙনাগের (৩৪৫-৪২৫খ্রীঃ) মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে ন্যায়বার্ত্তিক রচনা করেন। উদ্দ্যোতকরের ওই ন্যায়বার্ত্তিক ষষ্ঠ শতাব্দীতে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বাচস্পতির *ন্যায়-বার্ত্তিক তাৎপর্য টীকা* ন্যায়শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ। বাচস্পতি এ গ্রন্থে বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙনাগ, ধর্মকীর্তি, প্রজ্ঞাকর, সুভূতি প্রমুখ পণ্ডিতের মত খণ্ডন করে স্বীয়মত প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে বৌদ্ধদের শূন্যবাদের স্থলে আত্মবাদ প্রতিষ্ঠিত হলো এবং নিরীশ্বরতার স্থলে সেশ্বরবাদ স্থাপিত হলো। উদয়নের *ন্যায়-বার্ত্তিক তাৎপর্য পরিশুদ্ধি*, ও *ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি*, জয়ন্তভট্টের *ন্যায়-মঞ্জরী* প্রভৃতি গ্রন্থে ন্যায়সূত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রঘুনাথ শিরোমণি একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ও বিতার্কিক ছিলেন। তিনি তাঁর শিক্ষাগুরু পক্ষধর মিশ্রকে তর্কে পরাজিত করেন। এতে তাঁর গুরু পক্ষধর মিশ্র পণ্ডিত রঘুনাথকে ন্যায়শাস্ত্রের উপাধি দান করেছিলেন। এর পূর্বে ন্যায়শাস্ত্রের উপাধি শুধু মিথিলায় দেওয়া হতো। রঘুনাথ ছিলেন নবদ্বীপের অধিবাসী। রঘুনাথ স্বাধীনভাবে ও নির্ভীকচিত্তে নতুন নতুন মতের অবতারণা করেছেন। তিনি গৌতম ও কণাদের মতবিরুদ্ধ অনেক মত সমর্থন করে পদার্থতত্ত্বনিরূপণ বা পদার্থখণ্ডন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি এই গ্রন্থে অসম্পূর্ণ প্রাচীন মতের পূর্ণতা ও প্রচলিত প্রাচীন মতের নিরসন করেছেন। উপরিউক্ত প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ শুধু ন্যায়সূত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেননি; তাঁরা বিতর্কের মাধ্যমে ন্যায়দর্শনের সিদ্ধান্তগুলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা বৌদ্ধ জৈনাদি মতগুলোকে তর্কশাস্ত্রপ্রসূত সূক্ষ্ম যুক্তিজালের প্রভাবেই বারংবার তাদের পর্যুদস্ত করেছেন। বিতর্কসভায় ঠিক শব্দপ্রয়োগ যে কত মহিমান্বিত, প্রতিবাদের ভাষা যে কত গম্ভীর, সুকৌশল বাচনভঙ্গি যে কত বিচিত্র প্রজ্ঞাময়, সীমাবদ্ধ জ্ঞান যে কত অসম্মানের, অপশব্দের প্রয়োগ যে কত দুঃখদায়ক, ঠিক সময়ে ঠিক বিষয়ের অবতারণায় অক্ষমতা যে কত অবমাননাকর প্রভৃতি বিষয়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন নৈয়ায়িকেরা। মূলত ন্যায়শাস্ত্রে বিতর্কের কিছু পরিভাষা নিয়ে আলোচিত হয়েছে। শুধু অবান্তর কথা দিয়ে বিতর্ক হতে পারে না। নৈয়ায়িকেরা শিখিয়েছেন শুদ্ধ বিতর্কের শৈল্পিক রীতি।

ন্যায়দর্শনে নিঃশ্রেয়স লাভের উপযোগী ষোল প্রকার পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় বলা হয়েছে। সেগুলো হলো– (১) প্রমাণ (২) প্রমেয় (৩) সংশয় (৪) প্রয়োজন (৫) দৃষ্টান্ত (৬) সিদ্ধান্ত (৭) অবয়ব (৮) তর্ক (৯) নির্ণয় (১০) বাদ (১১) জল্প (১২) বিতণ্ডা (১৩) হেত্বাভাস (১৪) ছল (১৫) জাতি (১৬) নিগ্রহস্থান —

> প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাসচ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ । ন্যায়দর্শন ॥১॥

এর মধ্যে অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, নিগ্রহস্থান পদার্থগুলিতে বিতর্কের বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। এখানে এ পদার্থগুলি সম্পর্কে *ন্যায়দর্শন* গ্রন্থ অনুসরণে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

অবয়ব : প্রতিজ্ঞা হেতূদাহরণোপনয়নিগমনান্যবয়বাঃ। ন্যায়দর্শন ॥ ৩২॥

– প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগম নামে পাঁচটি বাক্য অবয়ব।

প্রতিজ্ঞা : সাধ্যনির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা। ॥৩৩॥ — সাধ্য নির্দেশকে প্রতিজ্ঞা বলে। পাঁচটি অবয়বের প্রথম অবয়ব 'প্রতিজ্ঞা'। বাদীর বক্তব্য কী? বাদী যে বাক্যের দ্বারা সর্বাগ্রে তাঁর বক্তব্য বলবেন সেই বাক্যটির নাম প্রতিজ্ঞা। যেমন : 'মনুষ্যমাত্র নশ্বর' — এরূপ বাক্য প্রতিজ্ঞা। সর্বত্রই প্রতিজ্ঞা বাক্যের দ্বারা সাধনীয় ধর্ম মাত্রের বোধ জন্মে। সাধ্যের বোধক বাক্যই প্রতিজ্ঞা।

হেতু : উদাহরণসাধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতুঃ ॥৩৪॥–উদাহরণের সাথে সমান ধর্মপ্রযুক্ত সাধনীয় পদার্থের সাধনত্ববোধক বাক্য বিশেষ হেতু। অর্থাৎ যে বাক্যের দ্বারা বাদী তার হেতু পদার্থকে জ্ঞাপক বলে বুঝাবেন — তাই হেতু বাক্য।

উদাহরণ : সাধ্যসাধর্ম্যাত্তদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্ ॥৩৬॥ –সাধ্যধর্মীর সাথে সমানধর্ম প্রযুক্ত সেই সাধ্যধর্মীর ধর্মটি যেখানে বিদ্যমান থাকে, এমন দৃষ্টান্ত পদার্থের বোধক বাক্যবিশেষ উদাহরণ। যেমন– 'শব্দ অনিত্য' এই কথা দ্বারা নৈয়ায়িক প্রথমত সাধ্যধর্মীকে প্রকাশ করবেন। এটাই তার প্রতিজ্ঞা বা সাধ্যনির্দেশ। এর জ্ঞাপক কী? নৈয়ায়িক বলবেন উৎপত্তি ধর্মকত্ব। এই দ্বিতীয় বাক্য তার হেতু বাক্য। তখন নৈয়ায়িক বলবেন, যে পদার্থের উৎপত্তি হয় তা অনিত্য। শব্দের উৎপত্তি হয় সুতরাং শব্দও অনিত্য। যেমন স্থালী প্রভৃতি দ্রব্য। কুম্ভকারগণ যে স্থালী প্রভৃতি তৈরি করেন — তা সর্বসম্মতভাবে অনিত্য। এ হতে বুঝতে পারা গেল যে, যা উৎপন্ন হয় — তাই অনিত্য। সুতরাং নৈয়ায়িকের তৃতীয় বাক্যের নাম উদাহরণ।

আবার, সাধ্যধর্মীর বৈধর্ম প্রযুক্ত বিপরীত দৃষ্টান্তও উদাহরণ — তদ্বিপর্য্যয়াদ্বাবিপরীতম্ ॥৩৭॥ যেমন : (১) শব্দ অনিত্য (২) উৎপত্তি ধর্মকত্ব জ্ঞাপক (৩) অনুৎপত্তিধর্মক এমন আত্মা প্রভৃতি নিত্য। এখানে সাধ্যধর্মীর ধর্ম যে অনিত্যত্ব তা আত্মা প্রভৃতিতে নেই।

উপনয় : উদাহরণাপেক্ষস্তথেত্যুপসংহারো ন তথেতি বা সাধ্যস্যোপনয়ঃ ॥ ৩৮॥ — সাধ্যধর্মীর সম্বন্ধে অর্থাৎ যে ধর্মীতে ধর্মবিশেষের অনুমান করতে হবে, তা উদাহরণ অনুসারে 'তথা' অর্থাৎ তদ্রূপ ' অথবা ন তথা' তদ্রূপ নয় — এই প্রকারে উপসংহার অর্থাৎ হেতুর উপন্যাস উপনয়। উপনয় বাক্য উদাহরণ

বাক্যের অপেক্ষা করে, উদাহরণ বাক্যের পরে তদনুসারে উপনয় বাক্যের প্রয়োগ করতে হয়। এজন্য মহর্ষি গৌতম বলেছেন 'উদাহরণাপেক্ষা'। 'তথা' এবং ' ন তথা' এর দ্বারা উপনয় বাক্যের বিশেষ লক্ষণ বলা হয়েছে। উদাহরণ বাক্য ব্যতীত হেতু পদার্থে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তি প্রদর্শন হয় না। সুতরাং হেতু পদার্থকে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য বলে বুঝিয়ে সাধ্যধর্মীতে সেই হেতু পদার্থের উপসংহার করতে হবে এবং তাই উপনয় বাক্য। সুতরাং উপনয় উদাহরণ সাপেক্ষ।

নিগমন : হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্বচনং নিগমনম্ ॥৩৯॥ — হেতু কথনপূর্বক প্রতিজ্ঞা বাক্যের পুনঃ কথন 'নিগমন'।

তর্ক : অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ত্ব জ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ ॥৪০॥ — অজ্ঞাত তত্ত্ব পদার্থে যে পদার্থ সামান্যত জ্ঞাত, কিন্তু তার প্রকৃত তত্ত্বটি বোঝা যাচ্ছে না, মনে সংশয় হচ্ছে এমন পদার্থে তত্ত্বটি জানার জন্য প্রমাণের উপপত্তি প্রযুক্ত যে 'ঊহ' জ্ঞান বিশেষ তা 'তর্ক '। যে পদার্থের সামান্য জ্ঞান আছে, কিন্তু তার বিশেষ ধর্মে সংশয় হওয়ায় তত্ত্বটি বোঝা যাচ্ছে না, এমন পদার্থে 'এই পদার্থকে জানব' এরূপ জিজ্ঞাসা জন্মে। এটা এরূপ না এরূপ নয় এই সংশয় হয়। আত্মা নিত্য না অনিত্য এই সংশয় নষ্ট না করতে পারলে প্রমাণ কিছু করতে পারে না। এজন্য তর্ক আবশ্যক।

নির্ণয় : বিমৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ ॥৪১॥ — এই তর্ক বিষয়ে অর্থাৎ পূর্বোক্ত তর্কস্থলে সংশয় করে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থাৎ স্বপক্ষের সংস্থাপন এবং পরপক্ষের সাধনের খণ্ডনের দ্বারা পদার্থের অবধারণ 'নির্ণয়'।

কথা অর্থাৎ বিচার্য বিষয়ে বাদী ও প্রতিবাদীর যথানিয়মে উক্তি ও প্রত্যুক্তির বাক্য ত্রিবিধ হয়। যথা : বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা।

বাদ : প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ ॥ ১।৪২॥ — ত্রিবিধ কথার মধ্যে যাতে প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা স্বপক্ষ সংস্থাপন ও অপর পক্ষ সংস্থাপনের খণ্ডন হয় এবং যা সিদ্ধান্তের অবিরুদ্ধ এবং যাতে প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পক্ষ অবয়বের প্রয়োগ হয়, এমন যে পক্ষ প্রতিপক্ষ পরিগ্রহ, তাই বাদ।

জল্প : যথোক্তপপন্নশ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ভো জল্পঃ ॥ ২।৪৩॥ — যথোক্তপপন্ন অর্থাৎ পূর্বসূত্রে বাদের লক্ষণ বলতে যে সকল বাক্য বলা হয়েছে, সে সকল বাক্যের যে অর্থ, সেই অর্থযুক্ত, অধিকন্তু ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা যাতে সাধন ও উপলম্ভ হয় তাই জল্প।

বিতণ্ডা : সপ্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতণ্ডা ॥ ৩।৪৪॥ — সেই জল্প প্রতিপক্ষের স্থাপনাহীন হয়ে বিতণ্ডা হয়। আত্ম পক্ষের স্থাপন না করে কেবল পরপক্ষ খণ্ডন করব,তার হেতুর দোষ প্রদর্শন করব এই বুদ্ধিতেই বিতণ্ডা হয়ে থাকে।

নিগ্রহস্থান : বিতর্কে পরাজয়ের কারণ বা নিগ্রহস্থানের আলোচনায় ন্যায়দর্শন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ন্যায়দর্শনে কথিত ষোলোটি পদার্থের মধ্যে নিগ্রহস্থান হলো অন্তিম পদার্থ। বিতর্কে প্রবৃত্ত হলে কতভাবে বাদী ও বিবাদী নিগৃহীত হতে পারেন নিগ্রহস্থান তার সুনির্দিষ্ট পরিচয় দেয়। বাদী ও বিবাদী নিজেদের খুশিমত অবধারণ করতে পারবেন না। অবধারণের মূলে থাকতে হবে নির্দিষ্ট তথ্য, অকাট্য হেতু, প্রতিজ্ঞায় অবিচল আস্থা। ন্যায়শাস্ত্রে বাইশ প্রকার নিগ্রহস্থানের উল্লেখ আছে। ন্যায়শাস্ত্রে উল্লেখিত এ নিগ্রহস্থানগুলোর পরিচয় তুলে ধরা হলো—

১. প্রতিজ্ঞাহানি : বাদী যদি তাঁর প্রতিজ্ঞাত অর্থের বিরুদ্ধ অর্থ স্বীকার করে নেন অথবা প্রতিজ্ঞাত অর্থকে পরিত্যাগ করেন, তাহলে তাঁর প্রতিজ্ঞাহানি নামক নিগ্রহস্থান হয়।
২. প্রতিজ্ঞান্তরম্ : প্রতিবাদী কর্তৃক প্রদত্ত দোষ উদ্ধার করার জন্য বাদী যদি পূর্বে অনুক্ত কোনো বিশেষণ প্রতিজ্ঞাত অর্থের সাথে জুড়ে দেন, তবে তাঁর প্রতিজ্ঞান্তর নামক নিগ্রহস্থান হয়। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞান্তর হলো নতুন চিন্তায় যুক্তি স্থানান্তর করা।
৩. প্রতিজ্ঞাবিরোধ : নিজের প্রযুক্ত সাধ্যের বিরুদ্ধ হেতুর নাম উল্লেখ করার নাম প্রতিজ্ঞাবিরোধ নামক নিগ্রহস্থান। অর্থাৎ নিজের প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্যের স্ববিরোধিতা করা।
৪. প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস : প্রযুক্ত হেতুতে দোষ দেখে প্রতিজ্ঞাত বাক্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করা।
৫. হেত্বন্তরম্ : প্রতিবাদীর প্রদত্ত দোষ দেখে সেখানে নিজের হেতুতে কোনো বিশেষণ প্রয়োগ করার নামই হেত্বন্তরম্ নিগ্রহস্থান।
৬. অর্থান্তরম্ : আলোচ্য বিষয়ের অনুপযোগী কথা বলার নাম অর্থান্তরম্।
৭. নিরর্থকম্ : অর্থহীন শব্দের প্রয়োগকে নিরর্থকম্ বলে।
৮. অবিজ্ঞাতার্থম্ : দুরভিসন্ধিবশত কেবল অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করতে দুর্বোধ্য বাক্যের প্রয়োগ।
৯. অপার্থকম্ : পরস্পর অসম্বন্ধ অর্থের বাচক পদসমূহের প্রয়োগ অপার্থক নামক নিগ্রহস্থান।
১০. অপ্রাপ্তকালম্ : বিষয়ের উপস্থাপনের সময় নির্দিষ্ট ক্রমের লঙ্ঘন।

১১. অধিকম্ : অপ্রয়োজনে একাধিক হেতু বা উদাহরণের প্রয়োগ। যেমন : 'শব্দঃ অনিত্যঃ, শব্দত্বাৎ শ্রাবণত্বাচ্চ' এরূপ বাক্যের প্রয়োগ।

১২. ন্যূনম্ : পাঁচটা অবয়ববাক্যের মধ্যে যে কোনো একটি বা একাধিক অবয়বশূন্য বাক্যের প্রয়োগই 'ন্যূন' নামক নিগ্রহস্থান।

১৩. পুনরুক্তম্ : বিনা প্রয়োজনে শব্দ বা অর্থের পুনরায় উল্লেখ। যেমন : 'শব্দঃ অনিত্যঃ, শব্দঃ অনিত্যঃ' ইত্যাদি।

১৪. অননুভাষণম্ : বিচারসভাস্থ মধ্যস্থগণ তিনবার বলে দিলেও বাদী যদি অনুবাদ করতে না পারেন, তবে তিনি 'অননুভাষণম্' নামক নিগ্রহস্থানের কবলে পড়বেন।

১৫. অজ্ঞানম্ : বাদীর কথা মধ্যস্থগণ বুঝেছেন, এমন অবস্থায় বাদী তিনবার বলে দিলেও প্রতিবাদী যদি তার অর্থ না বোঝেন, তবে তাঁর অজ্ঞান নামক নিগ্রহস্থান হবে।

১৬. অপ্রতিভা : বাদীর কথা বুঝেও উত্তর প্রদানে মৌন থাকাকে অপ্রতিভা বলে।

১৭. বিক্ষেপ : বাদীর কথার উত্তর করা সম্ভব নয় বুঝে প্রতিবাদী যদি হঠাৎ ' ওহোহো' আমার এই সময় একটা প্রয়োজনীয় কাজ ছিল, এরূপ বলে বিচার পরিত্যাগ করেন, তবে 'বিক্ষেপ' নামক নিগ্রহস্থানে নিগৃহীত হবেন।

১৮. মতানুজ্ঞা : নিজ পক্ষে প্রদত্ত দোষ দূর না করেই পরপক্ষের দোষ দেখিয়ে আত্মতুষ্টি লাভ।

১৯. পর্যনুযোজ্যোপেক্ষণম্ : পরপক্ষে উদ্ভাবনীয় নিগ্রহস্থানের অনুদ্ভাবনের অর্থাৎ তুমি নিগৃহীত হলে — এই অপ্রিয় সত্য কথনে অক্ষমতার নামই পর্যনুযোজ্যোপেক্ষণ।

২০. নিরনুযোজ্যানুযোগঃ : পরপক্ষে যেস্থলে বস্তুত নিগ্রহস্থান নেই, সে স্থলে যদি নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করা হয় তাহলে নিরনুযোজ্যানুযোগঃ নিগ্রহ হয়।

যেমন — হেরেছ, হেরেছ বলে মিথ্যা কলঙ্কারোপ করে একটা আত্মতৃপ্তির স্বাদ নেওয়া।

২১. অপসিদ্ধান্ত : স্বসিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত অবলম্বন করে বলার নামই অপসিদ্ধান্ত।

২২. হেত্বাভাস : অসৎ হেতুর প্রয়োগ।

নৈয়ায়িক দার্শনিকদের ভাবনা হলো, সভায় বিতর্কে অবতীর্ণ বাদী ও প্রতিবাদী যেন নিগৃহীত না হন। ন্যায়শাস্ত্র অনাকাঙ্ক্ষিত নিগ্রহস্থান পরিহারের জন্য এর উপায় বিশ্লেষণ করে জয়-পরাজয় নির্ণয়ের দিক্ নির্দেশ করেছে।

প্রাচীন ভারতে বিতর্কের অঙ্গনে শঙ্করাচার্য চিরস্মরণীয়। দাক্ষিণাত্যের কেরল রাজ্যে ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বেদান্ত ভাষ্য রচনা করেন। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের নাম হলো তর্কপাদ। বেদান্ত হলো ব্রহ্মবিচারাত্মক শাস্ত্র। পরমত খণ্ডন করে নিজ মতকে যুক্তিযুক্তভাবে তর্কপাদ এই অধ্যায়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রতিপক্ষকে পরাভূত করার এই কৌশলটি অসাধারণ নৈপুণ্যের সাথে তিনি উপস্থাপন করেছেন। উপযুক্ত উদ্ধৃতিসহ, যৌক্তিকভাবে তিনি পরমতকে অন্তঃসারশূন্য হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন। কেননা তিনি মনে করতেন প্রতিপক্ষের মতকে অযৌক্তিক, তুচ্ছ প্রমাণিত করতে না পারলে স্বপক্ষের স্থিরতা অসম্ভব। এজন্য তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি—

প্রতিপক্ষভূতানি সংখ্যাদিদর্শনানি নিরকরণীয়ানি।

এখন কথা হলো, মুমুক্ষুদের কাছে তত্ত্বজ্ঞান দানের জন্য কেবল নিজের মতাদর্শ ব্যক্ত করা কি যথেষ্ট নয়? পরপক্ষকে নিরাকরণ মানেই তো অন্যের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাব পোষণ করা, তার ক্ষুদ্রতা লোকসমাজে তুলে ধরা। সুতরাং তর্কশিল্পে প্রতিপক্ষীকে নাস্তানুবাদ করায় মহত্ত্বের কিছু নেই। শঙ্করাচার্যের মতে, প্রচারের মহিমা অপরিসীম। নিরন্তর প্রতিপক্ষীদের প্রচারিত অপপ্রচারে মন্দবুদ্ধি মানুষ সহজেই আকৃষ্ট হতে পারেন। শঙ্করাচার্য তাঁর গ্রন্থে নিজ যুক্তি দ্বারা কপিল, পতঞ্জলি, কণাদ, পঞ্চশিখ, বুদ্ধ প্রমুখ বিখ্যাত দার্শনিকদের প্রবর্তিত দর্শনের অসারতা প্রতিপাদনে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি তর্কে অবতীর্ণ হয়ে অন্যদের বিশ্লেষিত ব্যাখ্যাকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন।

কথিত আছে, শঙ্করাচার্য বেদান্তভাষ্য রচনা করে ভট্টপাদ কুমারিলের নিকট শাস্ত্রবিচারের উদ্দেশে উপস্থিত হন। কুমারিল ভট্টপাদ শঙ্করাচার্যের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি প্রথমে বৌদ্ধ মতবাদকে খণ্ডন করে বেদের কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য স্থাপন করেন। কিন্তু পরে আবার তিনি বিতর্কসভায় বৌদ্ধ পণ্ডিত দ্বারা পরাভূত হয়ে বৌদ্ধমণ্ডলীর সদস্য হন। কিন্তু তিনি ছিলেন মূলত বৈদিক কর্মকাণ্ডের অর্থাৎ পূর্বমীমাংসা দর্শনে বিশ্বাসী। শঙ্করাচার্য যখন কুমারিল ভট্টের নিকট উপস্থিত হলেন তখন তিনি বললেন :

> আমি প্রকৃতপক্ষে এখন মৃত। আমার প্রধান শিষ্য মণ্ডন মিশ্রের নিকট গমন করুন। তিনি পরাভূত হলেই আমি পরাভূত বলে জানবেন।

মাহিষ্মতী নগরে নর্মদা তীরে শঙ্করাচার্য ও মণ্ডনমিশ্রের শাস্ত্রবিচার অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্কের মডারেটর বা বিচারক ছিলেন বিদুষী উভয়ভারতী দেবী। তিনি ছিলেন মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী এবং কুমারিল ভট্টের ভগিনী। সে যুগে স্ত্রীশিক্ষা কেমন উৎকর্ষ ছিল উভয়ভারতী তার প্রমাণ। বিচারক ঘোষণা করবেন — বিতর্কে কে বিজয়ী আর কে পরাজিত। যিনি পরাজিত হবেন, তিনি স্বমত পরিত্যাগ করে অপরপক্ষের মতবাদ গ্রহণ করবেন। আচার্য শঙ্কর পরাজিত হলে তিনি মণ্ডনমিশ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সংসারী হয়ে যাগ-যজ্ঞ পালন করবেন। আর মণ্ডনমিশ্র পরাজিত হলে তিনি বয়সে নবীন শঙ্করাচার্যের শিষ্যত্ব বরণ করে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হবেন। বিতর্ক আরম্ভ হওয়ার প্রথমে উভয়ভারতী শঙ্করাচার্য ও মণ্ডনমিশ্র উভয়ের গলে সদ্যফোটা ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন।

বিতর্ক শুরু হলো। শানিত যুক্তির বাচিক শক্তিতে উভয়পক্ষ তর্কযুদ্ধে পরস্পরকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছেন। শঙ্করাচার্য ও মণ্ডনমিশ্র উভয়েই খ্যাতনামা বিতার্কিক। কথিত আছে, মণ্ডনমিশ্রের বাড়ির শুকপাখিটি পর্যন্ত জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য অথবা ভেদাভেদ নিয়ে তর্ক করতে পারত। শঙ্করাচার্যের মুখ হতে অনর্গল যুক্তিধারা নির্গত হতে লাগল। তিনি তর্কে বেদের কর্মকাণ্ডের উপর জ্ঞানকাণ্ডের, পূর্বমীমাংসার ওপরে উত্তরমীমাংসার প্রাধান্য স্থাপন করলেন। মণ্ডনমিশ্র পরাভূত হলেন, কিন্তু তিনি শির আনত করলেন না। পরাজয়ের গ্লানিতে তিনি তখন ক্ষুব্ধ, রুষ্ট ও যথেষ্ট উত্তেজিত। ফলে তাঁর কণ্ঠের পুষ্পমালা দেহের তাপে হলো ম্রিয়মাণ। এদিকে শঙ্করাচার্য ধীর-স্থির-শান্ত-সৌম্য সন্ন্যাসী। তাঁর কণ্ঠের পুষ্পমালা তখনও সজীব-স্নিগ্ধ-সুরভিত-অম্লান। সত্যদর্শনে উভয়ভারতীর দৃষ্টি স্থির নিশ্চিত হলো। তিনি শঙ্করাচার্যের জয় ঘোষণা করলেন। মণ্ডনমিশ্র শঙ্করাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সন্ন্যাসী হলেন।

মূলত শঙ্করাচার্যের প্রতিভার অমিতদ্যুতিতে তাঁর প্রচারিত অদ্বৈতবাদ ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান দর্শনমত বলে পরিগণিত হয়েছে। তিনি 'প্রস্থানত্রয়ী'র অর্থাৎ উপনিষদ, বেদান্তসূত্র ও ভগবদ্গীতার ভাষ্যে এই মতানুযায়ী ব্যাখ্যা প্রচার করেছেন এবং পরমত খণ্ডন করে নিজস্ব মত স্থাপন করেছেন। 'তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ' এই মতানুসারে তিনি প্রত্যেক যুক্তির সঙ্গেই আপ্তপ্রমাণ বাক্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি ধীর, স্থির ও সংযতভাবে বিপক্ষের মত পরীক্ষা করেছেন এবং কোনো প্রকার শ্লেষ বা কটাক্ষ না করে পরমত খণ্ডন করেছেন। তাঁর গম্ভীরতা ছিল অতুলনীয়। তাঁর 'প্রসন্নগম্ভীরবচঃ' প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরও শির আনত করত।

কেবল শঙ্করাচার্য নন, নৈয়ায়িকের খণ্ডনে বৌদ্ধ, বৌদ্ধের খণ্ডনে নৈয়ায়িক, মীমাংসকের খণ্ডনে নৈয়ায়িক, আবার নৈয়ায়িকের খণ্ডনে মীমাংসক প্রভৃতি দর্শন সম্প্রদায় একে অপরের কাছে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় বিতর্ককেই মাধ্যম হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন।

সংস্কৃত ব্যাকরণে বিতর্ক

বিতর্কশিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতে ব্যাকরণ রচনার নানাবিধ পদ্ধতির মধ্যে চূর্ণির উল্লেখ করতেই হয়। 'চূর্ণি' নামকরণ থেকে অনুমিত হয় যে, এতে প্রতিপক্ষের মতকে চূর্ণ করার নানা কৌশল প্রদর্শিত হয়েছে। 'চূর্ণয়তি শতশঃ খণ্ডয়তি বিপক্ষকানাং তর্কজালমিতি চূর্ণিঃ'— যে গ্রন্থ প্রতিপক্ষীয়দের তর্কজালকে চূর্ণ করে, তাকে বলা হয় চূর্ণি। মূলত মহাভাষ্যই চূর্ণিগ্রন্থ। মহর্ষি পতঞ্জলি এর রচয়িতা। পতঞ্জলি তাঁর গ্রন্থে কখনো বার্তিককে সমর্থন করেছেন, কখনো তাঁর দোষ উদ্ভাবন করে পাণিনিকে সমর্থন করেছেন। কাত্যায়ন যেখানে যেখানে পাণিনীয় সূত্রের অসম্পূর্ণতার উল্লেখপূর্বক বিরূপ সমালোচনা করেছেন, পতঞ্জলি সেগুলো খণ্ডন করে তার যাথার্থ্য প্রতিপাদনে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর যুক্তিতর্কের শানিত ভঙ্গি ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের পরাকাষ্ঠা সূত্রভাষ্য রচনার উজ্জ্বলতম শৈলী।

সংস্কৃত সাহিত্যে বিতর্ক

দ্বাদশ শতাব্দীর কবি শ্রীহর্ষ বিতর্কচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তার রচিত 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' বিতর্কচর্চার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অনুসরণীয় গ্রন্থ। গ্রন্থের নাম থেকেই বোঝা যায়, পরমতখণ্ডনই লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য । প্রতিপক্ষ দার্শনিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এটি অসাধারণ একটি শানিত অস্ত্রের ভাণ্ডার হয়ে উঠেছে। প্রসিদ্ধ চিৎসুখাচার্য এই গ্রন্থের অনুসরণে তাঁর 'প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা বা চিৎসুখী' রচনা করেন ও ন্যায়মত খণ্ডন করে বেদান্ত মত প্রতিষ্ঠিত করেন। খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের আরও অনেক টীকা আছে। শঙ্কর মিশ্র, বিদ্যাসাগর, রঘুনাথ শিরোমণি প্রমুখ পণ্ডিত এ গ্রন্থের টীকা রচনা করেছেন। কবি শ্রীহর্ষের মতে— তাঁর 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' গ্রন্থের চেয়ে অধিক বিচারবাদী তাঁর নৈষধীয়চরিত —

> "ষষ্ঠঃ খণ্ডনখণ্ডতোঽপি সহজাৎ ক্ষোদক্ষমে তন্মহা-
> কাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গোঽগমদ্ভাস্বরঃ ॥ নৈষধ.৬/১১৩

কবি শ্রীহর্ষ 'নৈষধীয়চরিতের' দশম সর্গে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত দময়ন্তীর রূপের বর্ণনা তর্কবিদ্যার পরিভাষায় উপস্থাপন করেছেন। যেমন :

> অবৈমি বাদিপ্রতিবাদিগাঢ়স্বপক্ষরাগেণ বিরাজমানে।
> তে পূর্বপক্ষোত্তরপক্ষশাস্ত্রে রদচ্ছদৌ ভূতবতী যদীয়ৌ ॥ নৈষধ. ১০/৮০

– বাদী ও প্রতিবাদীর আপন আপন পক্ষ সম্বন্ধে গাঢ় অনুরাগ থাকে। এইভাবে পূর্বপক্ষশাস্ত্র ও উত্তরপক্ষশাস্ত্র বিরাজ করে তাঁর দুটি অধর হয়েছে জানি।

> উদ্দেশপর্বণ্যপি লক্ষণেঽপি দ্বিধোদিতৈঃ ষোড়শভিঃ পদার্থৈঃ।
> আন্বীক্ষিকীং যদ্দশনদ্বিমালীং তাং মুক্তিকামাকলিতাং প্রতীমঃ ॥ নৈষধ. ১০/ ৮২

– আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ তর্কবিদ্যার নাম উল্লেখপর্বে ও লক্ষণপর্বে দু'বার ষোলটি পদার্থের কথা বলে। সেই আন্বীক্ষিকী তাঁর দু-সারি মুক্তোর মতো দাঁত হয়েছে। এখানে কবি শ্রীহর্ষ কাব্যিকভাবে তর্কবিদ্যার চমৎকার উপস্থাপন করেছেন। আমরা জানি, 'অন্বীক্ষ্যতে সমীক্ষ্যতে অনয়া ইতি আন্বীক্ষিকী' তর্কবিদ্যা। ন্যায়শাস্ত্রে ষোড়শপদার্থ স্বীকৃত। পদার্থনির্ণয় ও পদার্থলক্ষণবিচার প্রসঙ্গে তাদের দু-বার উল্লেখ থাকায় তারাই বুঝি দময়ন্তী দেবীর বত্রিশটি দন্তমুক্তা।

> তর্কা রদা যদ্বদনস্য তর্ক্যা বাদ্দেঽস্য শক্তিঃ ক্ব তথঽন্যথাতৈঃ।
> পত্রং ক্ব দাতুং গুণশালিপুগং ক্ব বাদতঃ খাণ্ডয়িতুং প্রভুত্বম্ ॥ নৈষধ. ১০/ ৮৩

– তর্কযোগ্য তর্কিত পদার্থগুলো তাঁর দাঁত। তাছাড়া শাস্ত্রবিচারে এই মুখের শক্তি কোথায়? প্রতিপক্ষের প্রতিজ্ঞাপত্র কীভাবে খণ্ডিত হবে? গুণী ব্যক্তিদের শাস্ত্রবিচার দিয়ে খণ্ডন করার সামর্থ্য কোথায় থাকবে?

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তে একথা মানতেই হবে, কাব্য ও তর্কবিদ্যার জগতে সমান দক্ষতায় পদসঞ্চার করেছেন কবি শ্রীহর্ষ। এই বহু প্রতিভার স্বীকৃতি তিনি নিজেই উচ্চারণ করেছেন—

> যৎকাব্যং মধুবর্ষি ধর্ষিতপরাস্তর্কেষু যস্যোক্তয়ঃ
> শ্রীশ্রীহর্ষকবেঃ কৃতিঃ কৃতিমুদে তস্যাভ্যুদীয়াদিয়ম্ ॥ নৈষধ. ২২/১৫৩

– যাঁর কাব্য মধুবর্ষণ করে, আবার তর্কে যাঁর কথায় প্রতিপক্ষ পরাজিত হয়, সেই শ্রী শ্রী হর্ষকবির এই কাব্যকৃতিটি কীর্তিমান্ ব্যক্তিদের আনন্দবিধানের জন্য অভ্যুদয় লাভ করুক।

বিতর্ক সত্যপ্রকাশের অন্যতম বাহক। যুক্তির বন্ধনে নিজেকে আলোকিত করেছিলেন প্রাচীন ভারতের সত্যসন্ধানী যুক্তিবাদী ঋষিগণ। নির্দ্বিধায় বয়োবৃদ্ধ কোনো পণ্ডিত অপেক্ষাকৃত কম বয়সী পণ্ডিতের কাছে জ্ঞানালোচনায় হেরে গিয়ে সানন্দে তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেছেন। শুদ্ধচিন্তার বাহক এই বিতর্কই পারে শুভচৈতন্যের বিকাশ ঘটাতে। প্রাচীন ভারতের বিতার্কিকগণ ছিলেন সত্য-সুন্দর-কল্যাণের পূজারী। জ্ঞানের আলোয় তাঁরা নিজেদের আলোকিত করেছিলেন। অযৌক্তিক অবান্তর বিষয়কে তাঁরা কখনও গ্রহণ করেননি।

যাঁরা যুক্তিবাদী, যুক্তির মালা দিয়ে যাঁরা নিয়ত সত্যের সন্ধান করেন তাঁদের বক্তব্য লেখায় — তাঁরা মুক্তচিন্তার মানুষ। তাঁরা যুক্তির জালে মুক্তির আলোর সন্ধানী। তাঁদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় যুক্তিবিরোধী সমাজের এক অশুভ শক্তি। সেই অশুভ শক্তি যুক্তিবাদী মানুষের মতাদর্শকে ভয় পায়। কেননা তাদের সাধ্য নেই ভিন্ন যুক্তি দিয়ে সেই মতবাদের বিপরীতে প্রতিবক্তব্য উপস্থাপন করা। তাই তারা বেছে নেয় ভিন্ন পথ। লেখা কিংবা বক্তব্যের উত্তর প্রতিলেখা বা প্রতিবক্তব্যের মাধ্যমে হলে বিতর্কচর্চার একটা ভালো প্লাটফর্ম তৈরি হতো। এর মাধ্যমে সমাজে বিরাজ করত সুস্থতা। আমাদের দেশে আজ নানাভাবে শুদ্ধ বিতর্ক ও মুক্তচিন্তা ব্যাহত। অনেক প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিশ্রুতিশীল যুক্তিবাদী মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। অনেকের জীবন বিপন্ন, যুক্তিহীন বিবেকহীন অশুভ শক্তির কাছে। যুক্তির আলোয় মুক্তির দ্যুতিতে যাঁরা জীবনে অন্যকে পথ দেখান — তাঁদের প্রতিপক্ষরা কেন হাতে তুলে নেবে শানিত ছুরি? এর কারণ একটিই — এরা যুক্তিবাদী নয়, এরা বিতর্ককে ভয় পায়, এদের রয়েছে বিদ্যাবিচারের অভাব। আলোকময় যুক্তিকে পরিহার করে এরা আশ্রয় নেয় অন্ধ তমিস্রায়, মসির বিপরীতে এরা হাতে তুলে নেয় অসি। এরা অন্ধকারের যাত্রী। এখান থেকে কি আমাদের মুক্তি নেই? অবশ্যই আছে। এখান থেকে মুক্তির একটি ভালো মাধ্যম হতে পারে বিতর্কচর্চা। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন অপরের মতবাদকে যুক্তিবিচার দিয়ে আমরা কীভাবে গ্রহণ করে জীবনকে আলোকিত করা যেতে পারে সে সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

> বীভৎস কার্যকলাপে অন্ধকারাচ্ছন্ন এই পৃথিবীতে আশা ও ভরসার একটি প্রবল উৎস হচ্ছে যুক্তির পথে এগোনোর সম্ভাব্যতা। তার কারণটি সহজেই বোঝা যায়। কোনো কিছুতে যদি আমরা তৎক্ষণাৎ অতিশয় বিচলিত বোধ করি, বিরক্ত হই, আমরা চাইলে আমাদের সেই প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারি। জিজ্ঞাসা করতে পারি, আমাদের সেই প্রতিক্রিয়া যথাযথ কি না এবং আমাদের আচরণ তার দ্বারা নির্ধারিত হওয়া উচিত কি না। অন্য মানুষ, অন্য সংস্কৃতি, অন্যদের দাবি এ সব আমরা কী চোখে দেখব, তাদের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করব — তা আমরা যুক্তি দিয়ে বিচার করতে পারি এবং শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার পক্ষে বিভিন্ন যুক্তিগুলিকে বিবেচনা করতে পারি। আমরা নিজেদের ভুলগুলিকেও যুক্তিপূর্ণভাবে বিচার করতে পারি ও চেষ্টা করতে পারি যাতে সেগুলির পুনরাবৃত্তি না ঘটে। (অমর্ত্য, ২০১৫ : ২৬৬)

আমাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বিতর্কের ভূমিকা অনেক বেশি। প্রাচীন ভারতবর্ষের তার্কিকতার ঐতিহ্য জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে চর্চার মাধ্যমে আমরা গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারি। এ সম্পর্কে অমর্ত্য সেন মন্তব্য করেছেন এভাবে :

> গণতন্ত্র গণ-আলোচনা ও পারস্পরিক মত বিনিময়ের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। গণ-আলোচনার ঐতিহ্যটি সারা বিশ্ব জুড়েই দেখতে পাওয়া যায়, শুধুমাত্র পশ্চিমা দুনিয়াতেই নয়। এই ঐতিহ্য থেকে যেখানে যত বেশি শিক্ষা গ্রহণ করা হবে, সেখানে গণতন্ত্রের স্থাপনা ও সংরক্ষণ তত সহজ হয়ে উঠবে। ... গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে খোলাখুলি আলোচনা, সমাজ ও আমাদের নিজ নিজ পছন্দ-সম্পর্কিত তথ্যকে বিপুলভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে সরকারি নীতিগুলিকে গণ-আলোচনার দ্বারা প্রভাবিত, গৃহীত ও সংশোধিত করারও একটি সুযোগ এনে দেয়।... ভারতের তার্কিকতার ঐতিহ্যের ভূমিকা শুধুমাত্র মূল্যবোধগুলির প্রকাশ্য-অভিব্যক্তি সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয়, এটি পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে মূল্যবোধগুলির গড়ে ওঠার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। (অমর্ত্য, ২০১৫ : ১২)

আমরাও স্বপ্ন দেখি — আহা! আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় জীবনে যদি এমন বিতর্কের চর্চা হতো। যুক্তির বন্ধনে একদিন আমরা হব একত্র; যেমন প্রাচীন ভারতের যুক্তিবাদী বিতার্কিকেরা বিদ্যাবিচারের জন্য একত্র হতেন। সেখানে ভিন্নমত পোষণের জন্য কারও প্রাণসংশয় হতো না। পারস্পরিক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে কোনো মতের স্থায়িত্ব হতো। আমরা আলোর প্রত্যাশী। শুদ্ধ বিতকচর্চার মাধ্যমে আমরা আলোকিত হব।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

অখিল বন্ধু সাহা [সম্পা] (১৯৮২)। *সাংখ্য দর্শন ও ন্যায় দর্শন*, প্রথম প্রকাশ, মুদ্রক : আবদুল বারী, সারওয়ার প্রিন্টিং হাউস, ১৬/২, পাঁচ ভাই ঘাট লেন, ঢাকা -১

অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ [অনূদিত ও সম্পাদিত], (১৯৮৬)। *উপনিষদ*, অখণ্ড সংস্করণ, হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০০০৭।

অন্নম্ভট্ট, *তর্কসংগ্রহঃ* (দীপিকাসহিতঃ), শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী [সম্পা], প্রকাশক : দণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ আনন্দবোধাশ্রম, মোহান্তঃ রাজগুরু সুমেরু মঠ, ডি ৩৪/১২৩ গণেশ মহল, বারাণসী -১

অমর্ত্য সেন, (২০১৫)। *তর্কপ্রিয় ভারতীয়*, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

অমলেশ ভট্টাচার্য (২০১১)। প্রথম প্রতিভাস সংস্করণ, *রামায়ণ কথা*, বইপাড়া পাবলিকেশনস্, কলকাতা।

কল্যাণী কার্লেকর (১৩৬৫ বঙ্গাব্দ)। *ভারতের শিক্ষা*, জিজ্ঞাসা প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ-আশ্বিন, ১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯

জাহ্নবীচরণ ভৌমিক, (১৩৮২ বঙ্গাব্দ)। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস* (বৈদিক ও লৌকিক), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৯৮৮)। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, আর্য ম্যানসন (নবম তলা), ৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০০১৩

বিধুশেখর শাস্ত্রী [অনূদিত], *শতপথব্রাহ্মণ* (প্রথম-দ্বিতীয় কাণ্ড), ভূমিকা : শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দেশ, ১০১/সি,বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা।

প্রসূন বসু [সম্পাদিত], (১৩৯০ বঙ্গাব্দ)। *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার* (১৪ খণ্ড), প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৯০, নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

মৎসদানন্দযোগীন্দ্র, (১৩৭৯ বঙ্গাব্দ)। *বেদান্তসার*, পণ্ডিতবর কালীবর বেদান্তবাগীশকৃত অনূদিত, দি সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট- কলিকাতা-১২

মহর্ষি বাল্মীকি, *রামায়ণম্*, ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত ও অনূদিত, (১৯৭৬)। প্রথম সংস্করণ, নিউ লাইট, কলকাতা।

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-*মহাভারতম্*, (বনপর্ব, ৮ম খণ্ড), শান্তিপর্ব (৩৭ খণ্ড), শ্রীমৎ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ [অনূদিত] (১৩৮৪ বঙ্গাব্দ)। দ্বিতীয় সংস্করণ,বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা-৯।

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় [সম্পা ও অনূ], (১৪১৬)। দ্বিতীয় সংস্করণ, *মনুসংহিতা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।

যোগীরাজ বসু (১৯৭৫)। *বেদের পরিচয়*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন, (২০১২)। *মহামানব বুদ্ধ*, ভূমিকা ও সম্পাদনা-যতীন সরকার, বুক্স শাহ্ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় প্রকাশ, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা।

রুবী বড়ুয়া ও বিপ্রদাশ বড়ুয়া, (১৯৯৭)। *গৌতম বুদ্ধ : দেশকাল ও জীবন*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ৬৭ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

শান্তিকুসুম দাশগুপ্ত, (১৪১৪ বঙ্গাব্দ, ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ)। *প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

সুখময় ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ, (১৩৬৬ বঙ্গাব্দ)। *মহাভারতের সমাজ*, দ্বিতীয় প্রকাশ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, বোলপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, (১৯৪১)। *আমাদের পরিচয়*, বীণা লাইব্রেরী, প্রথম মুদ্রণ, কলিকাতা।